# ধাতুর কথা

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত



# ধাতুর কথা

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

শরৎ বুক হাউস

১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

'বিজ্ঞান-কথা' সংগ্রহ ৩
প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৯১ সন



মূল্য : দশ টাকা

প্রকাশক : গৌতম রক্ষিত
১০/৩ সেণ্ট্রাল পার্ক
কলিকাতা-৩২

মুদ্রাকর : বঙ্কিম বিহারী দাস
"ওরিয়েণ্ট প্রেস"
১২৩/১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬।



প্রচ্ছদপট :
প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়
৫/১, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন
কলিকাতা-৫

বাবা-মা'র পুণ্য স্মৃতিতে

## ধাতুর কথা

—অধ্যাপক বেদুইন চক্রবর্ত্তী তার নানা ব্যস্ততার মধ্যেও এই বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে আমাকে সাহায্য করেছেন ; তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ বইয়েরও কয়েকটি ছবি কল্যানীয়া মালবিকা চৌধুরী এঁকে দিয়েছে, তার জন্য আমার স্নেহাশিস রইল।—

প্রঃ চঃ রঃ

# ১

## ধাতুর কথা

### পূর্বাভাস

বর্তমান মানবসভ্যতায় ধাতুর দান অপরিসীম। আজকের দিনে ধাতুকে বাদ দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম করা কল্পনার অতীত। কলমের নিব থেকে শুরু করে কামান বন্দুক পর্যন্ত, জলের পাইপ থেকে আরম্ভ করে মোটর ইঞ্জিন পর্যন্ত, সবই ধাতু নির্ভর। লাঙলের ফলাতে ধাতু আবার উড়োজাহাজেও ধাতু। যানবাহনে, অস্ত্রে, যন্ত্রে, মুদ্রায় সর্বত্রই কোন না কোন ধাতুর প্রয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় এবং তার ব্যবহার খুব বেশী পুরানো নয়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না। আজ থেকে প্রায় আট হাজার বছর আগে অর্থাৎ মোটামুটি ৬০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মানুষের ধাতু সম্পর্কে সচেতনতা আসে এবং তারও প্রায় একহাজার বছর পরে তার ব্যবহার শুরু হয়। এখন এযুগে অবশ্যই লোহা আর ইস্পাতের প্রয়োগ খুবই বেশী, কিন্তু প্রাচীনযুগে মানুষের সঙ্গে প্রথমে লোহার পরিচয় ঘটে নি। যে ধাতুর সঙ্গে মানুষ প্রথম পরিচিত হয়েছিল তা হল সোনা আর তামা। ধাতুর সন্ধান কি করে প্রথম সম্ভব হল সেটা জানতে হলে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটু পূর্বকথা বলা প্রয়োজন।

আজ থেকে অন্ততঃ দশলক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম অভ্যুদয় ঘটেছিল। আজকের দিনের হোমো-সেপিয়েনস্ বা বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে সেই আদিম যুগের মানুষের বিস্তর ব্যবধান। মানুষেরই নানা প্রজাতির মধ্য দিয়ে দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মস্তিষ্ক ইত্যাদির পরিবর্তন হতে হতে মানুষ আজকের আকার ও অবয়ব পেয়েছে। প্রথম যে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে পশুর জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। পরিমিত আহার সংগ্রহ আর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান ছিল মানুষের একমাত্র প্রয়োজন। বিশাল

এবং হিংস্র সব জন্তু-জানোয়ার দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে অতি প্রতিকূল অবস্থায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষকে প্রাণধারণ করতে হত। সে সময় বনজঙ্গলের গাছপালাই ছিল মানুষের বড় সহায় ও অবলম্বন। গাছের ফলমূলই ছিল তার প্রধান খাদ্য। জন্তুর আক্রমণের বিপদ থেকে ত্রাণ পাবার জন্য রাতের অন্ধকারে তাকে উচ্চ বৃক্ষের উপরেই আশ্রয় নিতে হত। আবার দিনের বেলায় গাছের ডাল ভেঙে নিয়েই সে হিংস্র পশুর আক্রমণকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হত। গাছের ডাল ছিল তার প্রথম হাতিয়ার। এ ছাড়াও মানুষ তখন বড় বড় পাথর ছুঁড়েও দূর থেকে শত্রুকে আঘাত করত। ঐ পাথর দিয়েই সে কাছিম, হরিণ, আর ছোট ছোট প্রাণীকে মেরে তার কাঁচা মাংস দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। কখনও কখনও মানুষ দেখতে পেত, হঠাৎ পাথরটি হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে আর পাথরের ধারালো এবং ছুঁচলো মুখ বের হয়েছে। এসব দেখে মানুষের একটু বুদ্ধি খেলল, সে পাথর ভেঙে ভেঙে বা ঘষে ঘষে সেটাকে তীক্ষ্ণ ও প্রখর করে তুলে ব্যবহার করতে শুরু করল। খাদ্যের প্রয়োজনে শিকারের পশু বধ করতে, কুপিয়ে মাংস কাটতে, মাটিতে গর্ত করে গাছের মূল তুলতে এমনি তীক্ষ্ণতর পাথরের যন্ত্র অনেক সুবিধা এনে দিল। প্রত্নবিদেরা নানা স্থানে—মধ্য প্রাচ্যে, প্যালেস্টাইনে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ ভারতে, স্পেনে মাটি খুঁড়ে আর গুহার মধ্যে এইসব পাথরের হাতিয়ারের সন্ধান পেয়েছেন। শিলাতো সহজে নষ্ট হয় না ; কালজয়ী এইসব পাথর সেই সুদূর অতীতের ইতিবৃত্ত নিঃশব্দে আমাদের সামনে খুলে ধরেছে। এর সঙ্গে মানুষ গাছের ডালের প্রান্তটিকেও ছুঁচলো করে কিংবা অতিকায় জন্তুর শক্ত হাড়কে শানিত করেও ঐভাবে প্রয়োজনে লাগাতে শিখল। এসব মানুষের প্রথম যন্ত্র। এভাবে মানুষ প্রথম যন্ত্র-স্রষ্টা হল। যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার শুরু সেই পাথরের অস্ত্র ব্যবহার থেকে। যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ বড় বড় পশুকে হারিয়ে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। বর্তমানের মানুষের সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মূলে যন্ত্রের দান অপরিসীম। আজও মানুষ নূতন থেকে নূতনতর যন্ত্র তৈরী করে চলেছে ক্ষমতা আর প্রগতির তাগিদে।

সেই পুরাকালের মানুষের আর একটা বিষয়ে ছিল প্রচণ্ড ভীতি—সেটা হল অগ্নিদানব। মাথার উপরের আকাশে মেঘে মেঘে বিদ্যুতের দীপ্তি ও বজ্র নির্ঘোষে সে বিস্ময়ে হতবাক হত এবং ভয় পেত। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎসারিত লেলিহান অগ্নিশিখাকে সে ভয় করত, প্রচণ্ড দাবানলে বন ছারখার হয়ে পুড়ে যেতে দেখে সে ভয়ে পালাত। এমনি সময় হয়ত কখনও কখনও হাতের গাছের ডালটি দাবানলের সংস্পর্শে এসে কিংবা জ্বলন্ত লাভার

ছোঁয়া লেগে হঠাৎ জ্বলে উঠত। তার চেয়েও বেশী সম্ভাবনা, দুটি পাথর ঘষে ঘষে যন্ত্র বানানোর সময় একটা ফুলকি গিয়ে শুকনো কাঠ বা ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এ থেকেই মানুষ আগুন সৃষ্টি করার কৌশলটি শিখে নিয়েছিল সন্দেহ নেই। অর্থাৎ যে অগ্নিদানব মানুষের ভীতির কারণ ছিল, সে মানুষের হাতের মুঠোয় বন্দী হল। আগুন জ্বালাবার পদ্ধতির আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রায় নিয়ে এল এক আশ্চর্য পরিবর্তন। মানুষের যাত্রাপথে এক নতুন পদক্ষেপ আরম্ভ হল। সভ্যজগতে প্রবেশ করার প্রথম দুয়ারের চাবিকাঠি তার হাতে এল।

অল্পকালের মধ্যেই মানুষ অগ্নিকে সরাসরি তিনটি প্রয়োজনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রথমতঃ, আগুন জেবলে সে গুহাবাসী সবলতর হিংস্র পশুকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই গাছ থেকে নেমে গুহাতে অনেক নিরাপদ আশ্রয় পেল। আগুনের ভয়ে পশু গুহা ছেড়ে দূরে সরে গেল। দ্বিতীয়তঃ, অগ্নির উত্তাপ মানবদেহে অনেক আরাম এনে দিল। নগ্নদেহের শীতের কাঁপুনি আর দুরন্ত শীতের রাত্রির বিভীষিকা থেকে সে রক্ষা পেল। তৃতীয়তঃ, মানুষ আগুনে মাংসকে ঝলসিয়ে নিয়ে খেতে অভ্যস্ত হল। আগে কাঁচা মাংস খাদ্য ছিল, সেটা কষ্টসাধ্য ছিল, আর হজমেও সময় লাগত বেশী। একদিন হয়ত খেতে খেতে একটুকরো কাঁচা মাংস হঠাৎ আগুনে পড়ে গিয়েছিল। সেই পোড়া মাংস খেয়ে দেখল সেটা বেশ স্বাদু। অথবা এমন হতে পারে, দাবানলে পোড়া কোন জন্তুর মাংস খেতে গিয়ে মানুষ প্রথম আগুনে ঝলসানো মাংসের স্বাদ পেয়েছিল। বলা যেতে পারে, এইভাবেই মানুষের পাকশিল্পে প্রথম দীক্ষা হয়েছিল।

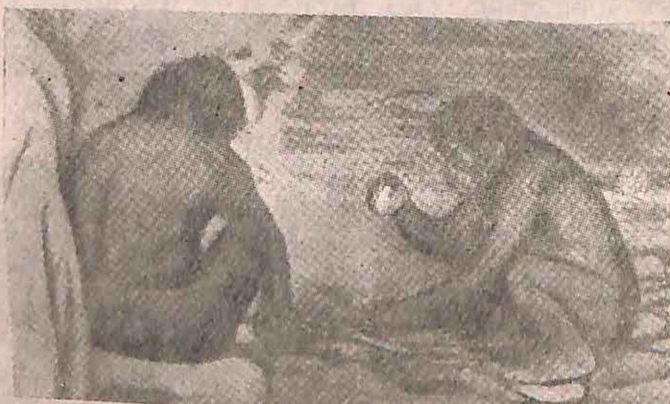
প্রাচীন মানবের ব্যবহৃত অনেক গুহাতে দেখা গেছে সেখানে পোড়ামাটি আর ছাই রয়েছে। আর তার সঙ্গে বা কাছাকাছি রয়েছে পাথুরে হাতিয়ার এবং হরিণ, মহিষ প্রভৃতি নানারকম জন্তুর ঝলসানো হাড়গোড়। এসব থেকেই তখনকার মানুষের স্বভাব কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। মানুষ পশু শিকার করে আনত, জঙ্গলের অজস্র কাঠ নিয়ে এসে গুহাগৃহে আগুন জ্বালাত, মৃত জন্তুকে পাথরের অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে প্রিয় খাদ্যে পরিণত করে নিত। অবশ্য এর সঙ্গে গাছের ফলমূলের অফুরন্ত ভাণ্ডার তো ছিলই। এই ছিল পুরাকালের প্রাণধারণের প থা।

হাতিয়ার এবং যন্ত্র তৈরী করতে এবং প্রয়োগ করতে পেরেছিল বলেই বহুগুণ অধিকতর বলশালী পশুকে মানুষের পক্ষে জয় করা সম্ভব হয়েছিল। এই কাজে মানুষের মস্তিষ্ক তথা বুদ্ধি সহায় হয়েছে। পশুর পেশীশক্তি, দন্ত,

নখর ছিল বটে, কিন্তু সে হাতিয়ার তৈরী করতে সক্ষম ছিল না। দূর থেকে পশু তার শত্রুকে আঘাত বা হনন করতে পারত না, তাই পশুকে মানুষের কাছে পরাজয় বরণ করতে হল। পাথরের কুড়াল, বর্শা ইত্যাদি তৈরী করার শিল্প আয়ত্ত করতে এবং ব্যবহার শিখতে অবশ্যই লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গিয়েছিল। পাথুরে যন্ত্রের উপর নির্ভর করেই তখন মানুষের শক্তির বিকাশ; ধাতু তখন মানুষের অজানা ছিল। সেইজন্য ঐ পুরাকালের যুগটাকে প্রস্তর যুগ বলা হয়। বস্তুতঃ জীবনযাত্রার পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিচার করে নৃতত্ত্ববিদেরা মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন ঃ

১। পুরাপ্রস্তর যুগ    ২। নবপ্রস্তর যুগ
৩। তাম্র যুগ    ৪। কাংস্য যুগ
৫। লৌহ যুগ    ৬। আধুনিক বিজ্ঞান যুগ।

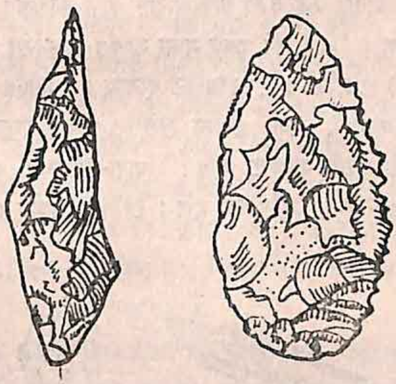
মানবজাতির সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত কালটিকে বলে "পুরাপ্রস্তর যুগ (Paleolithic era)"। সে যুগের প্রথম দিকে প্রকৃতিলব্ধ খণ্ডিত পাথরই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ধীরে ধীরে মানুষ বড় বড় পাথর থেকে স্থূলধরণের অস্ত্র ও যন্ত্র তৈরী করতে সমর্থ হল, তার মধ্যে প্রধান ছিল কুপিয়ে কাটবার জন্য কুড়াল, দূর থেকে আঘাত-হানার জন্য বর্শা, চাঁছনি বা ছুরির অনুরূপ ফলক ইত্যাদি। এরপর ফ্লিন্ট জাতীয় কঠিনতর পাথর দিয়ে অন্য শিলাকে



চিত্র ১। আদিম যুগের মানুষ চকমকি পাথরের যন্ত্র তৈরী করছে

কেটে কেটে যন্ত্র তৈরী করার কৌশল শিখল। কালের অগ্রগতির সঙ্গে, মানুষের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে পাথর দিয়ে যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরী করার কৌশলেরও

খানিকটা উন্নতি নিশ্চয়ই হয়েছিল। মানুষ প্রথমে যে সব পাথুরে হাতিয়ার ব্যবহার করত তাদের বলা হয় ইয়োলিথ (eolith)। এই প্রস্তরযুগের মানুষ আহার-সংগ্রহ এবং আত্মরক্ষার উপায় নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল—একথা আগেই বলেছি। তার জীবনযাত্রার উন্নতি সেই কারণে এত মন্থর ছিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়।

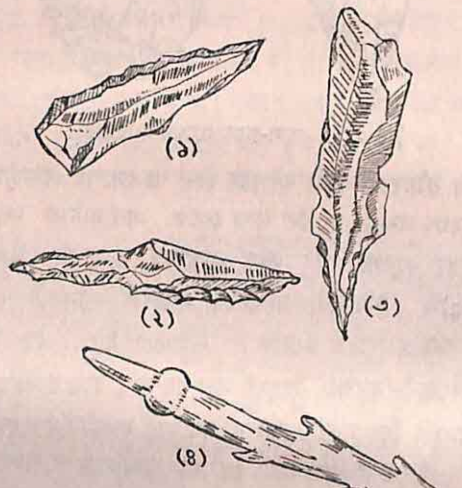


চিত্র ২। পুরা-প্রস্তর যুগের হাতিয়ার

সময়ের একটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করে টানা না গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় পুরাপ্রস্তর যুগের সমাপ্তি ঘটেছে আজ থেকে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। পুরাপ্রস্তর যুগের পর এল নবপ্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক যুগ (Neolithic era)। ইতিমধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক খানিকটা দূরদর্শিতা আর পরিকল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। নবপ্রস্তর যুগে এর বিশেষ পরিচয় মেলে। এই নবপ্রস্তর যুগের বিস্তার মাত্র ছয়-সাত হাজার বছর; পুরাকালের তুলনায় প্রায় নগণ্য। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মানুষের জীবনধারার এমন অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছিল যে এই সময়টিকে পুরাকালের বিপ্লব-যুগ বলা যেতে পারে। এই যুগের প্রারম্ভেই মানুষ তার পাথুরে যন্ত্রগুলির অনেক উন্নতি সাধন করেছিল। সহজে এবং আরও জোরের সঙ্গে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য কুড়াল হাতলযুক্ত হল। এই সময়েই শক্ত জিনিষে ছিদ্র করার জন্য বেধন-যন্ত্র, বর্শা-নিক্ষেপক যন্ত্র প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হল। পাথরের তীক্ষ্ণ ফলক বা হাড়ের তৈরী ফলক বর্শা ও তীরের মাথায় বসিয়ে অস্ত্রকে আরও ক্ষুরধার করার কৌশল আয়ত্ত করা হল। প্যালেস্টাইন, মিশর, দক্ষিণ-ভারত, আফ্রিকা—অনেক অঞ্চলেই পুরাবিদেরা এসব বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন। এই সকল উন্নত ধরণের পাথুরে যন্ত্র সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে পদার্থবিদ্যার এক ক্ষীণ

সূত্রপাত। আর এরও অনেক আগে মানুষ যখন অগ্নি-প্রজ্বলনের উপায় আয়ত্ত করে, তখনই তার রসায়নে হাতে-খড়ি হয়েছিল।

এর চেয়েও বড় কথা মানুষ এই নবপ্রস্তর যুগে খাদ্য-সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হয়েছিল। যাযাবর মানব ঘুরতে ঘুরতে প্যালেস্টাইনে বা মিশরের নীল-নদের তীরে বিভিন্ন বন্য-তৃণের সন্ধান পেয়েছিল যার বীজ খাদ্যোপযোগী। আবার এই বীজ চাষ-আবাদ করে নবপ্রস্তর যুগের মানুষ খাদ্য-উৎপাদনে সমর্থ হল। এই সব তৃণই নানা সংকর প্রজাতির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত গম, বার্লি, ( যব ) প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মাটির নীচে বা গুহাতে পাথরের কাস্তে, নিড়ানী, খল, নোড়া প্রভৃতি পাওয়া গেছে ; স্পষ্টতঃই তখন চাষ-আবাদে পাথরের যন্ত্রই ব্যবহৃত হত। খাদ্য-উৎপাদন করতে পেরে মানুষ আহার সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল ; দৈনিক শিকার ও ফল-অন্বেষণ থেকে




চিত্র ৩। নবপ্রস্তর যুগের যন্ত্রাদি
(১) ছুরির ফলা (২) তীরের ফলা (৩) বেধন যন্ত্র (৪) হাপুর্ন

অনেকখানি মুক্তি পেল। ইতিমধ্যে ভেড়া, ছাগল, শুয়োর, গবাদি পশুকেও মানুষ ধীরে ধীরে পোষ মানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই পালিত পশুর অধিকাংশই মানুষের খাদ্য যুগিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মালবহনে বা চাষের কাজেও লাগানো হয়েছে। এদের চামড়া ব্যবহৃত হয়েছে পরিধেয় রূপে।

খাদ্য-উৎপাদন মানুষকে দুর্দিনের জন্য খাদ্য সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এনে দিল। আর সঞ্চয় করে রাখার জন্য ভাণ্ডের প্রয়োজন দেখা দিল। এর আগেই তার অভিজ্ঞতা হয়েছে মাটি আগুনে তেতে গেলে সেটা কঠিন হয়ে ওঠে, তখন জলে সেটার আর ক্ষতি হয় না। এই নবপ্রস্তর যুগেই মানুষ মৃৎশিল্পী হয়ে উঠল। শুধু যে নানাধরণের ছোট বড় মাটির পাত্র তৈরী হল তাই নয়; সেগুলিকে নানা বর্ণে ও চিত্রাঙ্কণে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলা হল। এ যুগেই আবার চামড়া ও বল্কলের বদলে গাছের তন্তু থেকে পরিধেয় তৈরী শুরু হল। নিউগিনি, সুইজারল্যান্ড, মিশরের হ্রদের তীরে এই নিওলিথিক যুগে গাছের খুঁটির উপরে বেশ মজবুত গৃহ তৈরী হয়েছিল, তারও নিদর্শন পাওয়া গেছে। নবপ্রস্তর যুগের মানুষ যথেষ্ট কর্মকুশলতা, প্রখর বুদ্ধি, উদ্যম এবং কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় রেখে গেছে। পরবর্তীকালে নীলনদের তীরে, সিন্ধু তীরে, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের তীরে যে সব সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল তার সকল বিদ্যা, কলাকৌশল, আয়োজনের ব্যবস্থা নবপ্রস্তর যুগেই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

আর এই নবপ্রস্তর যুগের প্রায় প্রারম্ভেই ধাতুর সঙ্গে মানুষের পরিচয় হল। পূর্বেই বলেছি যে দুটি ধাতুর সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল—সে দুটো হল সোনা আর তামা। এর প্রধান কারণ, পৃথিবীর অধিকাংশ সোনাই স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ মৌল অবস্থায় রয়েছে। তামারও বেশ খানিকটা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যেত। অবশ্য অনেক সময় মুক্ত তামা সবুজ কালো রঙে দেখা যায়, কিন্তু একটু পেটালেই লালচে উজ্জ্বল তামা বেরিয়ে আসে। পাথরের তুলনায় এই ধাতু দুইটির ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ নিঃসন্দেহে মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বালু এবং পাথরের মধ্যেই পাওয়া যেত সোনা আর তামা—অবশ্য এই দুটিকেই সেই যুগের মানুষ এক বিশেষ ধরণের শিলা বলে মনে করত। কিন্তু পাথরের মতো এগুলো ভঙ্গুর নয়, পিটিয়ে এদের আকৃতি বদলানো যায়। এই অসাধারণ গুণ প্রাচীন মানুষের মনে প্রচণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এই জন্যেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের তীব্র আকর্ষণ ছিল এই দুইটি ধাতুর প্রতি। পরিমাণে স্বল্প ও দুর্লভ তথা মহামূল্যবান, সুতরাং সোনা সর্বদাই অলঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তামা অনেক বেশী পাওয়া গেলেও সমধর্মিতার জন্য সোনার মত তামাও অলংকার বা বিলাস দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেই যুগে।

এই দুইটি ধাতুর ব্যবহার অবশ্যই প্রকৃত ধাতু যুগ আরম্ভ হওয়ার বেশ কয়েক হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল। সর্বত্র একই সময়ে যে ধাতুদ্বয় ব্যবহৃত হত তা নয়, তবে খ্রীস্টজন্মের চার হাজার বছর আগেই প্রায় সব মানুষই

সোনা ও তামার গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল। এর অবশ্য বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফরাসী দেশে নবপ্রস্তর যুগের ধ্বংসাবশেষ থেকে সোনার পুঁতি ও মালা পাওয়া গেছে। মিশরের প্রাচীন কবরে এবং ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন গুহা থেকে নানা রকমের সোনার অলঙ্কার আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬০ সালে রাল্‌ফ সলেকী পারস্যের টেপ্ সিয়ালকের দুর্গম গুহা থেকে একটি ছোট্ট তামার অলঙ্কার উদ্ধার করেছেন। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটা আজ থেকে অন্ততঃ দশ হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল। ১৯৬৪ সনে আনাতোলিয়ার মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চারটি পিন জাতীয় তামার বস্তু। এদের সৃষ্টিকাল আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে। এমনি আরও তামা ও সোনার প্রচুর অলঙ্কার আবিষ্কার হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের নানা জায়গায়, যাদের সৃষ্টি আনুমানিক ৬০০০-৫০০০ ( খ্রীঃ পূর্বাব্দ )।

## তাম্র যুগ

প্রথম পরিচয় সোনার সঙ্গে হলেও প্রস্তরযুগের পর স্বর্ণের যুগ আসেনি। কারণ, দুর্লভ সোনা সকল মানুষের প্রাত্যহিক কাজে, হাতিয়ার বা যন্ত্রের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। যে সামান্য সোনাটুকু পাওয়া যেত তার প্রায় সবটাই অধিকতর শক্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন গোষ্ঠীর করায়ত্ত ছিল। তামা সোনার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী এবং সহজলভ্য, তাই তামা ধীরে ধীরে পাথরের জায়গা দখল করে নিল। নবপ্রস্তর যুগের পরে এল তাম্র যুগ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কি করে লক্ষ লক্ষ বছরের পাথরের রাজত্বকে হটিয়ে দিয়ে তামা সেটা অধিকার করতে সক্ষম হল। এটা সম্ভব হয়েছিল তামা তথা ধাতুর কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকার জন্য। পাথরের কুড়াল বা বর্শা অল্পেই ভোঁতা হয়ে যায়, তার তীক্ষ্ন ফলকগুলি খুলে পড়ে বা ভেঙে যায়। সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করা বা সারানো কঠিন ও শ্রমসাধ্য। কিন্তু তামা ঘষে নিয়ে সহজেই ক্ষুরধার বর্শা, কুড়াল ইত্যাদি তৈরী করা সম্ভব এবং দীর্ঘ দিন সেটা ব্যবহার করা সম্ভব ; যদি ভোঁতা হয়ে যায় তবে আবার শাণিত করে সহজেই তাকে প্রখর করা যায়। এই ধাতুকে পিটিয়ে এবং ( পরবর্তীকালে দেখা গেছে ) গলিয়ে নিয়ে বিভিন্ন রূপে বা আকৃতিতে পাওয়া যেতে পারে। তামা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। গলিয়ে নিয়ে তাকে আবার কাজে লাগানো যায়। ভিন্ন ভিন্ন তামার টুকরা তাতিয়ে নিয়ে পিটিয়ে জোড়া দেওয়া চলে। শিলার এ সকল গুণ নেই।

মানুষ যখন তামার এসব চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হল স্বভাবতঃই তখন সে পাথরের পরিবর্তে তামাকে পছন্দ করল।

নবপ্রস্তর যুগের পরিসমাপ্তির একটা সঠিক সন তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। এই আধুনিক কালেও তো কোন কোন গভীর অরণ্যের আদিবাসীদের গাছ কাটতে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এস্কিমোরা এবং অনেক পলিনেশীয় দ্বীপের অধিবাসীরা এখনও পাথুরে অস্ত্র ব্যবহার করে। ওরা তামা দেখেছে কিনা সন্দেহ। এই বিংশ শতাব্দীতেও বাইরে থেকে আনা কোন লোহার জিনিসকে তারা অসম্ভব মূল্যবান মনে করে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক এমনি একটি দ্বীপে গিয়ে একটা লোহার পেরেকের বিনিময়ে ছয়টি শূকর পেয়েছিলেন। এটা নিশ্চিত, অনেকদিন ধরে নবপ্রস্তর যুগের পাথরের হাতিয়ার আর সোনা-তামার ব্যবহার পাশাপাশি চলেছিল। মেসোপটেমিয়ায়, ইরাকে, ইরানে, মধ্যপ্রাচ্যের নানা পাহাড়ী অঞ্চলের পাথরের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় তামা ছিল যথেষ্ট। পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেই তামা আলাদা হয়েছে অথবা মানুষ পাথরকে আগুন দিয়ে তাপিত করে ফাটিয়ে নিয়ে তামা সংগ্রহ করেছে। সেই তামা পিটিয়ে নিয়ে নানা উপকরণ প্রস্তুত করেছে। আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলেও ছিল প্রচুর তামা। সেখানে এই কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্তও স্বাভাবিক তামা নিয়েই নানা কাজে ব্যবহার করা হত। ক্রমে তামার চাহিদা সর্বত্রই বেড়ে গেল এবং স্বাভাবিক মুক্ত তামার অনটন দেখা দিল। আনুমানিক ৪৫০০~৪০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অর্থাৎ আজ থেজে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে আকরিক শিলা থেকে তাম্র-উৎপাদনের উপায়টি মানুষের আয়ত্তে এল। সেই থেকেই তাম্রযুগের শুরু; সভ্যতার সেটা উষাকাল। যেসব খনিজ-শিলার বিভাজন থেকে প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশন করা যায়, সেই সব পাথরকে ধাতুর 'আকরিক' বলা হয়।

প্রকৃতির স্বাভাবিক তামা সংগ্রহ করে ব্যবহার করা আর পাথরের আকরিক থেকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তামা উদ্ধার করে ব্যবহার করা— এই দুইয়ের মধ্যে অনেকটাই ব্যবধান। তামা আর অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই মানুষ নানা ধাতু সংযুক্ত পাথর বা ধাতব যৌগ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। বিভিন্ন শিলাচূর্ণ, যেমন সবুজ ম্যালাকাইট, (তাম্রযৌগ), নীল লাজাবর্দ বা ল্যাপিস-লাজুলি (অ্যালুমিনিয়াম যৌগ), লালচে হিমাটাইট (লোহ-যৌগ), ইত্যাদি দেহসজ্জায় বা চিত্রাঙ্কনে মানুষ পুরাপ্রস্তরযুগ থেকেই ব্যবহার করেছে। কিন্তু ওসব যৌগপদার্থ থেকে ধাতুকে উদ্ধার করার কথা ভাবতেও পারে নি।

পাথর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের উপায়টি কি করে মানুষ প্রথম আবিষ্কার করল তার ইতিহাস আজ সঠিক বলা সম্ভব নয়। তবে একটা বিশ্বাসযোগ্য অনুমান অবশ্যই করা যেতে পারে। নিওলিথিক যুগের শেষের দিকে মানুষ চমৎকার মাটির পাত্র বানাতে পারত তার বহু প্রমাণ আছে। এইসব মৃৎপাত্র তৈরী করার জন্য বড় বড় ঢাকা চুল্লীর প্রয়োজন হয়েছিল। পাত্রের উপর চিত্রাঙ্কণের জনা ম্যালাকাইট, কিউপ্রাইট, হিমাটাইট প্রভৃতি পাথরের গুঁড়ো ব্যবহার করত। এটা খুবই সম্ভব যে অনেক সময় এই রকম ম্যালাকাইট বা কিউপ্রাইট পাথর (যার মধ্যে তামা আছে) খানিকটা চুল্লীর ভিতরে পড়ে গেছে। সেখানে ছিল উত্তপ্ত কাঠ কয়লা আর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস (অপর্যাপ্ত বায়ুর জন্য)। ফলে ঐসব পাথর বিজারিত হয়ে সৃষ্টি করেছে জবাকুসুমসংকাশ উজ্জ্বল তামা। বারবার সে আগুনে ফেলে দিয়ে দেখেছে সবুজ ম্যালাকাইট থেকে জন্ম নিচ্ছে লালাভ তামা। আফ্রিকার কাটাংগায় নিগ্রোদের অতি প্রাচীন চুল্লীর ছাইয়ের মধ্যেও পাওয়া গেছে তামার গুটি। সেই চুলা হয়ত তাম্রযুক্ত খনিজ পাথরের তৈরী ছিল এবং সেখানে নিশ্চয়ই অনুরূপ উপায়েই তামার সৃষ্টি হয়েছিল। যে তামা মানুষ বহু পরিশ্রম করে পাথর ভেঙ্গে তিল তিল করে সংগ্রহ করত, সেটাকে পাথরের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। তামা উদ্ধারের জনা তাপমাত্রা প্রয়োজন প্রায় ৮০০° সেণ্টিগ্রেড। মৃৎ-শিল্পীর চুল্লীতে সেই তাপমাত্রা ছিল। আরও পরে যখন আবদ্ধ চুল্লীতে হাঁপরের সাহায্যে জোরে হাওয়া বইয়ে উচ্চতর উষ্ণতা ১১০০° সেণ্টিগ্রেড করা গেল তখন মানুষ অবাক হয়ে দেখল, সেই তামা গলে তরলে পরিণত হয়েছে। আবার ঠাণ্ডা করলেই সেই তরল জমে যায় কঠিন লালচে তামায়। সহজাত বুদ্ধিতেই কয়েক শতাব্দী পরে তরল তামাকে ছাঁচে ঢেলে নিয়ে সে বিভিন্ন উপকরণে পরিণত করতে সক্ষম হল। ধাতুবিদ্যায় মানুষ পারদর্শী হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই মানুষ সে সময় আরও নানা পাথর আগুনে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করেছিল। এমনি করেই হয়ত সে এক সময়ে রুপা এবং সীসার সন্ধানও পেয়েছিল। মিশরের অতি প্রাচীন কবরে সোনার সঙ্গে এসব ধাতুর বস্তুও পাওয়া গেছে। পাথর থেকে ধাতু নিষ্কাশিত করে ঢালাই করে তামার উপকরণ প্রস্তুত করা সম্ভবতঃ ইরাকেই প্রথম হয়েছিল। এই ব্যাপারে যে নিপুণতা, কৌশল এবং পরিকল্পনা প্রয়োজন, ইতিমধ্যে মানুষ সে সব গুণের অধিকারী হয়েছিল সন্দেহ নেই। এর মধ্যে কৃষি ও পশুপালনে, গৃহনির্মাণে, মৃৎশিল্পে, বয়নশিল্পে, গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণে মানুষের তখন অনেক অগ্রগতি হয়েছে।

## কাংস্যযুগ

তাম্রযুগ দীর্ঘায়ু হতে পায় নি। তামার উৎপাদন শুরু হওয়ার হাজার দেড়েক বছরের মধ্যেই ব্রোঞ্জ বা কাঁসা দেখা দিল। ধীরে ধীরে তাম্রযুগের বিলুপ্তি ঘটল। অবশ্য তামা আমরা এখনও ব্যবহার করি নানা কাজে, কিন্তু এখন তামার যন্ত্র বা অস্ত্রের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় না। যতদিন এই দুইটি প্রয়োজনে তামা অপরিহার্য ছিল সেই কালটিকেই তাম্রযুগ বলা হয়েছে। যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে তা'তে মনে হয় ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই কাঁসার প্রচলন হয়েছিল, সেই থেকেই কাংস্যযুগের আরম্ভ।

নানা অঞ্চলে কাঁসার তৈরী বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন জিনিষ পাওয়া গেছে, তবে কোথায় প্রথম কাংস্য-শিল্প শুরু হয়েছিল সেকথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। ক্রীট দ্বীপে ঈজিয়ান সভ্যতার মিনোয়ান কৃষ্টিকালের (৩০০০ খ্রীঃ পূঃ) পুরানো কাঁসার মূর্তি পাওয়া গেছে। সুমের অঞ্চলে ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণাংশে আর (Ur) রাজ্যের রাজাদের কবর খুঁড়ে বহু কাঁসার জিনিষের সন্ধান মিলেছে, যার সৃষ্টিকালও অন্ততঃ ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। সমসাময়িককালে ককেসীয় অঞ্চলেও উন্নত কাংস্যশিল্পের অস্তিত্ব ছিল তার চিহ্ন রয়েছে। মিশরের কবরে পাওয়া কাঁসার নানাদ্রব্যও আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ বছরের পুরানো। ২য় ট্রয় নগরী খনন থেকে প্রত্নবিদেরা যে সকল কাঁসার পাত্র উদ্ধার করেছেন সেগুলো প্রস্তুত হয়েছে ২৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেরও আগে। শুধু মধ্য প্রাচ্যে এই কাংস্য শিল্প আবদ্ধ থাকে নি। ভূমধ্য সাগরের তীর ধরে ধরে রোমের ভিতর দিয়ে কাঁসারীরা এই শিল্পকে বিস্তারিত করে দিয়েছে পশ্চিম ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পরে ইউরোপে এই কাংস্য শিল্পের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল সন্দেহ নাই।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা বলা প্রয়োজন। এই শতাব্দীর ষাটের দশকে অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র বিশ বছর আগে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে শ্যামদেশে বা থাইল্যাণ্ডে একটি গ্রামের মাটির তলা থেকে প্রচুর কাঁসার জিনিষ পাওয়া গেছে—বর্শা, কলসী, বালা ইত্যাদি। পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে এগুলো খ্রীঃ পূঃ ৩৬০০-এরও আগে তৈরী। মধ্য প্রাচ্য থেকে এই স্থানের দূরত্ব ১০০০০ কিলোমিটারেরও বেশী। সে সময় বাণিজ্যিক যোগাযোগ খুব ছিল মনে হয় না। নিজস্ব উপায়েই শ্যামদেশের মানুষ কাঁসা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল মনে হয়। চীন দেশে কাঁসার ব্যবহার ২৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে হয় নি। হ'তে পারে থাইল্যান্ড থেকেই চীনে এই শিল্প বিস্তার লাভ

করেছিল। চীনে তাম্রযুগ প্রায় দেখা দেয় নি ; চীনে সোজাসুজি কাঁসার যুগে চলে এসেছে পাথরের যুগ থেকে। এই সব থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে কাংস্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল আজ থেকে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষের সিন্ধু সভ্যতার কাল মোটামুটি ৩২৫০~২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। মহেঞ্জোদারো এবং হরাপ্পার অত্যাশ্চর্য প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, ছাড়াও রয়েছে অপরূপ কাঁসা ও পেতলের নানা মূর্তি ও বস্তু। তবে এখানে কাংস্য শিল্পের প্রচলন হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য বা থাইল্যাণ্ডের অনেকটা পরে। কিন্তু এটা এখন সর্বত্র স্বীকৃত যে সেই যুগের ভারতীয় কাংস্য-শিল্পীরা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও স্বর্ণশিল্পে তখন ভারতীয়দের দক্ষতা মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পীদের তুলনায় কম ছিল।

কাঁসার সন্ধান মানুষ কি করে প্রথমে পেল ? তামা তৈরী করতে গিয়ে সেদিনের তাম্রকারেরা নানা জায়গা থেকে পাওয়া ম্যালেকাইট আকরিক ব্যবহার করেছে। তখন ওরা এটা অবশ্যই লক্ষ্য করেছে, বিভিন্ন উৎস থেকে নিষ্কাশিত তামা সব ঠিক একরকম নয়। কোনটা খুব নরম, সহজে বেঁকে যায়, কোনটা ভঙ্গুর, কোনটা শক্ত, আবার কোনটা সহজে ধার নেয় না, সুতরাং অস্ত্র তৈরীর অনুপযুক্ত। স্বভাবতঃই ভাল তামার জন্য তাম্রকারেরা বিশেষ আকরিক পছন্দ করত। বিভিন্ন তামার গুণের এই তারতম্যের কারণ, তামার আকরিকে অন্যান্য ধাতু যেমন, আর্সেনিক, সীসা, নিকেল, লোহা ইত্যাদির যৌগ কিছু সর্বদাই মিশ্রিত থাকে। ঐসব আকরিকের বিজারণের ফলে যে তামা উৎপন্ন হয় তাতেও ঐসব ধাতু অল্পাধিক মিশে থাকে। ওদের উপস্থিতির জন্যই তামার গুণ বিভিন্ন হয়।

দুইটি ধাতুকে যদি একত্র গলান হয় তবে সচরাচর ওরা ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। সেই মিশ্রিত তরলকে ঠান্ডা করলে যে কঠিন মিশ্রধাতু পাওয়া যায় তাকে বলা হয় "ধাতু-সংকর" (alloy)। এই ধাতু-সংকরের গুণ বা ধর্ম আদি ধাতুদ্বয়ের থেকে খানিকটা আলাদা দেখা যায়। কাঁসাও একটি ধাতুসংকর ; তামার সঙ্গে টিনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। সচরাচর কাঁসাতে তিন থেকে দশ শতাংশ টিন থাকে। কখনও কখনও আরও কিছু বেশী থাকে। কাঁসা তাম্রজ ধাতু-সংকর।

তাম্রযুগের মানুষ যে তামা তৈরী করত সেগুলো বিশুদ্ধ তামা ছিল না। তামার সঙ্গে অন্য ধাতু কিছু মিশ্রিত থাকত। অর্থাৎ ওগুলো বিভিন্ন ধাতুসংকর ছিল। প্রথম যে ধাতুসংকর মানুষ পেয়েছিল সেটা ছিল তামা আর আর্সেনিকের। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ম্যালাকাইট আকরিক আর্সেনিক-যুক্ত

ছিল। এই ম্যালাকাইট পাথর থেকে উৎপন্ন তামাতে তাই আর্সেনিক মিশ্রিত থাকত। স্বাভাবিকভাবেই এই তামা-আর্সেনিক সংকরের সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় মানুষ দুইটি ধাতু পৃথক সংগ্রহ করে নিয়ে গলিয়ে মিশিয়ে এই ধাতুসংকর তৈরী করেনি। দুই-তিন দশক পূর্বে (1961) প্রত্নবিদেরা ইজরাইলে মরুসাগরের (Dead sea) নিকটে এক গভীর দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রাজদণ্ড, মুকুট ইত্যাদি পেয়েছেন। এগুলো তামা-আর্সেনিক সংকরের তৈরী, আর এদের সৃষ্টিকাল ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ।

পাথুরে আকরিক থেকে তামা উৎপাদন করতে পেরে মানুষের খুবই সুবিধা হয়েছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তামাকে পিটিয়ে বা গলিয়ে নিয়ে ঢালাই করে নানা প্রয়োজনীয় উপকরণ করা যায়, তামা সহজে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শুদ্ধতর তামার কিছু কিছু ত্রুটি ছিল। বিশুদ্ধ তামা বড় নরম এবং সহজেই বেঁকে যায়। তামার অস্ত্র বা যন্ত্র কঠিন আঘাত সইতে পারে না। তদুপরি ঢালাই করতে গেলে কঠিন তামার মধ্যে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ থেকে যায়। ছাঁচ থেকে ঢালাই ভাল হয় না, তামা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কিন্তু আর্সেনিক-যুক্ত তামা অনেক বেশি শক্ত, ছাঁচে ঢালাই করলে গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌ থাকে না, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর উষ্ণতায় সেটা গলে যায়। এই সব সুবিধার জন্য তখন যে সব আকরিক আর্সেনিক-যুক্ত সেইগুলিই মানুষ তামা উৎপাদনে ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু এই তাম্র-আর্সেনিক সংকরের একটা প্রধান দোষ ছিল। আর্সেনিক একটি তীব্র বিষ। চুল্লীতে ধাতু তৈরীর সময় নিশ্চয় বিষাক্ত বাষ্পে বহু মানুষ তখন প্রাণ হারিয়েছে। সুতরাং এই সংকরের ব্যবহার কিছু কাল পরে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

আর্সেনিকযুক্ত তাম্র-সংকরের গুণ দেখে মানুষের অনিসন্ধিৎসু মন তখন অন্যান্য বস্তু মিলিয়ে উন্নততর তামা পাওয়ার চেষ্টা করেছে। ফলে একসময়ে দেখেছে তামার সঙ্গে টিন যুক্ত হলে উত্তম ধাতু অর্থাৎ কাঁসা পাওয়া যায়। এমন হতে পারে, কোন জায়গার তামার আকরিকেই খানিকটা টিনের যৌগ মিশ্রিত ছিল। সেগুলো থেকে তাম্র-উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ কাঁসার সন্ধান পেয়েছিল।

টিনের আকরিক ক্যাসিটেরাইট—এই খনিজ থেকেও উচ্চতাপে বিজারণ করে টিন ধাতু পাওয়া যায়। মানুষ তখন ধাতুবিদ্যায় অনেকটা পারদর্শী। এমনও হতে পারে, নানা জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছে যদি তামার আকরিক ম্যালাকাইটের সঙ্গে কিছু ক্যাসিটেরাইট মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে উত্তম কাঁসার সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ এই করেই ব্রোঞ্জের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল।

মানুষ দেখল, কাঁসা তামার চেয়ে উৎকৃষ্টতর। তামার মত কাঁসা অত সহজে ভঙ্গুর নয়। কাঁসার কাঠিন্য অনেক বেশী, এর শক্তি বর্তমানের মৃদু-ইস্পাতের প্রায় সমান। কাঁসার বিষগুণ নেই। কম উষ্ণতায় গলিয়ে কাঁসা থেকে ছাঁচে সুন্দর ঢালাই করা যায়, গ্যাসের বুদবুদ থাকে না। সুতরাং পাথর আর তামার বদলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় অস্ত্র, যন্ত্র, পাত্র ইত্যাদি তৈরী করার জন্য এক উন্নত উপাদান পেয়ে গেল।

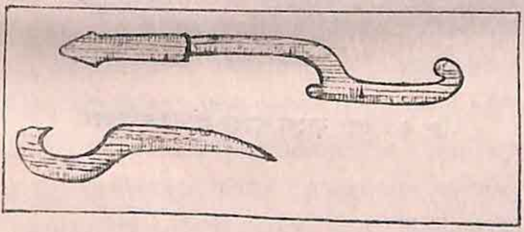
একটা প্রশ্ন অবশ্য উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্য বা মিশরে তো টিনের আকরিক নেই। আর টিন-যুক্ত তাম্র-আকরিক খুব সামান্যই দেখা যায়। তা হলে সেই যুগে অত কাঁসা কি করে তৈরী হল। অনেকে মনে করেন, মেসোপটেমিয়ার অনতিদূরের পাহাড়ে তখন টিনের আকরিক ছিল। পার্টিংটন লিখেছেন, ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দ্রাংগিয়ানো খনি থেকে সুমেরীয়রা টিনের আকরিক সংগ্রহ করত। বর্তমানে অবশ্য এসব অঞ্চলে টিন বিরল। ককেসীয় অঞ্চলের পাহাড়ে তামার আকরিক এবং টিনের আকরিক প্রচুর ছিল। ককেসীয়রা ব্রোঞ্জের জিনিষ তৈরী করতে সুদক্ষ ছিল। সুমেরের সঙ্গে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের আগে থেকেই ককেসাসের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল। খুবই সম্ভব এই ককেসাস থেকেই দক্ষিণাঞ্চলে টিনের আকরিক সরবরাহ হত। ইউরোপের জার্মেনী ও হাঙ্গেরীতে যথেষ্ট তামা আর টিনের খনিজ রয়েছে। আরও পরে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ২000 অব্দের সময় এইখানকার টিনও মধ্যপ্রাচ্যে চালান হয়েছে। কাঁসা তৈরীর জন্য মিশরের টিনের চাহিদা মিটিয়েছে ফিনিশীয় বণিকেরা। ফিনিশীয়রা সম্ভবতঃ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কর্নওয়াল থেকে মিশরে টিনের খনিজ সরবরাহ করত।

কাঁসার উৎপাদন যখন সহজ হয়ে এল তখন কাঁসা দিয়ে নানা প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন গাছ কাটার কুড়াল, লাঙলের ফলা, শস্য কাটার কাস্তে, খননের শাবল ইত্যাদি তৈরী হল। মূল্যবান কাঁসা থেকে অলঙ্কারও তৈরী হত, বিশেষতঃ কানের গহনা। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, খুব শীগগীরই কাঁসা থেকে প্রস্তুত হল বড় বড় ছোরা, বর্শা, তীর ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। কাঁসা অবশ্য তখন খুবই মহার্ঘ এবং সাধারণের পক্ষে পাওয়া কঠিন। সুতরাং এইসব কাংস্যবস্তু, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি, ছিল প্রধানতঃ সম্পদশালী এবং দলপতিদের অধিকারে। সাধারণ লোক তখনও পাথুরে হাতিয়ারই ব্যবহার করত। উন্নত কাঁসার অস্ত্র যাদের করায়ত্ত হল স্বভাবতঃই তারা অপরের উপরে আধিপত্য করতে আরম্ভ করল। কাঁসার অস্ত্র হল শক্তির উৎস, তাই কাঁসার অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। একে অপরের গলা কাটার বা শত্রু নিধনের

সহজতর উপায় পাওয়া গেল। এর ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর বিবাদ বিসংবাদ আর সংঘর্ষ অনিবার্য হল। তাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বেঁধে গেল। যুদ্ধ-বিগ্রহের গোড়াপত্তন হল। যে ধাতু মানুষের উপকারের জন্য এবং জীবনযাত্রা সহজতর করার জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল সেই ধাতুই আবার সভ্যতার উষাকালে যুদ্ধের জন্য ভীষণতর উপকরণ জুগিয়েছিল। লৌহযুগ আসার পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায়, কাঁসারীরা যোদ্ধাদের জন্য তৈরী করেছে সাজসরঞ্জাম, কাঁসার বর্ম, শিরস্ত্রাণ, হাতে দিয়েছে কাঁসার ঢাল, বল্লম, তীর, তলোয়ার। এসব শুধু যুদ্ধের তীব্রতাই বৃদ্ধি করেছে। যুগযুগ ধরে ধাতুর ব্যবহারের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মহাসমরের নিষ্ঠুরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না।

সেসময় তামার আকরিক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বা পাহাড়ের গা থেকে সংগ্রহ করা হত। ক্রমে যখন সেসব আকরিক নিঃশেষ হয়ে এল তখন কাংস্য শিল্পীরা আকরিকের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে যেতে শুরু করল। যেখানে উপযুক্ত খনিজ মিলত সেখানেই চুলা তৈরী করে কাঁসা বা তামা প্রস্তুত করত। এই ভাবেই ধাতু শিল্পটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। চাহিদা ছিল প্রচুর, বিশেষতঃ যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজনে। রোমক সভ্যতার দিনে কাঁসার বর্ম আর অস্ত্রই ছিল প্রধান ভরসা।

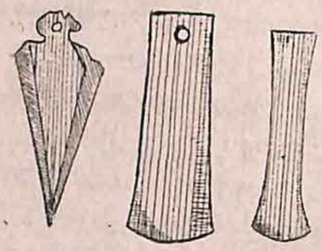
বর্তমানে ধাতব আকরিকের প্রায় সবটাই সুড়ঙ্গ খুঁড়ে মাটির তলা থেকে সংগৃহীত হয়। সেই প্রাচীন যুগেও অন্ততঃ কোথাও কোথাও খনির ভিতর থেকে আকরিক পাথর তুলে আনা হত—তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই কিছুদিন আগে প্রত্নবিদেরা পশ্চিম এশিয়ার নেগেভ মরুভূমি প্রান্তে পাহাড়ের ভিতরে প্রাচীন



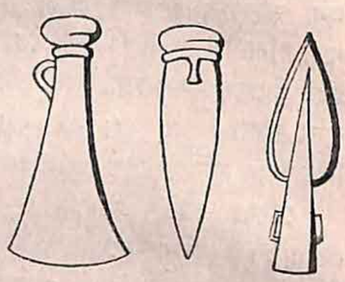
চিত্র ৪। সুমেরীয়দের তৈরী বাঁকা তামার তরবারি
(৩০০০ খ্রীঃ পূঃ)

সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। সেখান থেকে কাঁসার বাটালি আর পাথুরে হাতুড়ি দিয়ে কেটে কেটে আকরিক পাথর নিয়ে আসা হত। পরীক্ষায় দেখা গেছে

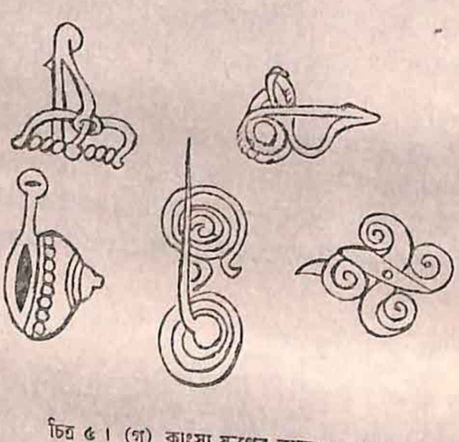
ঐসব কাঁসার বাটালি, ছেনি ইত্যাদি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের। শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত সুড়ঙ্গের মধ্যে বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্তরে চলা-ফেরার জন্য সিঁড়ি ইত্যাদি সবই ছিল। সুড়ঙ্গের বাইরের নিকটবর্তী অঞ্চলে আকরিক থেকে কাঁসা-উৎপাদনের জন্য ছিল অনেকগুলি চুলা।



চিত্র ৫। (ক) তামার প্রাচীনতম অস্ত্র



চিত্র ৫। (খ) কাংস্য যুগের অস্ত্র



চিত্র ৫। (গ) কাংস্য যুগের কানের অলংকার

## লৌহ যুগ

খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি কাংস্য যুগের পরিসমাপ্তি হল আর তার পরিবর্তে লৌহ যুগের অভ্যুদয় ঘটল। অতএব সভ্যতার সূচনার প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে লৌহের প্রচলন হল। লৌহ যুগের আরম্ভ অর্থাৎ সেই থেকে কাঁসার বদলে লোহা দিয়ে যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা আরম্ভ হল।

সর্বত্র যে একই সময়ে লৌহ যুগের আবির্ভাব হয়েছিল তা নয়। যেমন, নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ অব্দেই যথেষ্ট লোহার বস্তু ব্যবহৃত হত, আবার চীনে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের আগে লোহার প্রচলন ঘটে নি। কোথাও কোথাও যেমন, আফ্রিকা মহাদেশে ( মিশর ব্যতীত ) আবার পাথুরে যুগের পর সরাসরি লৌহ যুগ দেখা দিয়েছে। মাঝখানের তাম্র বা কাংস্য যুগের আগমন ঘটেনি।

কাঁসার আধিপত্য চলে যাওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ তামার আকরিকের অপ্রতুলতা এবং তাও বিশেষ কতকগুলো অঞ্চলে শুধু সীমিত পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই তুলনায় লোহার আকরিক যেমন প্রচুর তেমনই বহুধা বিস্তারিত, অধিকাংশ দেশেই সহজলভ্য। দ্বিতীয়তঃ লোহার ঋজুতা ও দৃঢ়তা কাঁসার চেয়ে বেশী, বিশেষতঃ ইস্পাতের ( সামান্য কার্বন-মিশ্রিত লোহা )। তা ছাড়া, লোহার অস্ত্রশস্ত্র কাঁসার অস্ত্রের চেয়ে বেশী শক্ত এবং বেশী ক্ষুরধার। এই জন্যই শুধু অস্ত্র নয়, সাধারণ ব্যবহার্য কুড়াল, কাস্তে, ছুরি, লাঙলের ফলা, কাটারি ও অন্যান্য দ্রব্য লোহা দিয়ে তৈরী করা শুরু হল। তামা, কাঁসা ছিল অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য। তাই কাঁসা তামার জিনিষ বা অস্ত্র ধনীদের ও উচ্চবংশীয় অভিজাতদের কাছেই শুধু ছিল। সাধারণ লোক, চাষী, মজুর, জেলে, দোকানী এরা পাথুরে যন্ত্রপাতি নিয়েই কাজ সম্পন্ন করত। কিন্তু লোহা ছিল অনেক সস্তা এবং পরিমাণেও অনেক বেশী, তাই সাধারণ লোকের দৈনন্দিন কাজকর্মেও লোহার জিনিষপত্র ক্রমে ক্রমে স্থান পেল। লোহার তৈরী শক্ত যন্ত্রপাতি সাধারণ মানুষ পাওয়াতে চাষ-আবাদ অনেক সহজ হল। বেশী শস্য উৎপাদন সম্ভব হল। ফলে, সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হল। মানুষ তখন সময় পেল শিল্প ও কারুকলায় নজর দিতে। বলা যেতে পারে, লোহাই প্রথম সার্বজনীন ধাতু। লোহার এই প্রাধান্য গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে অক্ষুণ্ন রয়েছে। আজও আমাদের জীবনযাত্রা ও কল-কারখানা যুগের সভ্যতা একান্তই লৌহ-নির্ভর। এই বিংশ শতাব্দীতে মাত্র পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করে সভ্যতা এক নতুন যুগে পদার্পণ করেছে। তবুও আরও বহুকাল যে লোহার উপর নির্ভর করেই আমাদের চলতে হবে সেটা নিঃসন্দেহ।

একটা সঙ্গত প্রশ্ন হচ্ছে, লোহার আকরিকের প্রাচুর্য যখন এত বেশী তখন তামার আগেই লোহার উৎপাদন ও প্রচলন হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ লৌহের উৎপাদন হয়েছে অনেক পরে। এই বিলম্ব হওয়ার কারণ ছিল। তামা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায়—মোটামুটি ৮০০-১০০০° সেণ্টিগ্রেডে—তৈরী করা

যায়, কিন্তু লোহার আকরিক থেকে ধাতু উদ্ধার করতে অন্যূন ১৬০০-১৭০০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। এত উচ্চ উষ্ণতার চুল্লী আদি যুগে তৈরী করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিতে তামার খানিকটা মুক্ত বা মৌলাবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল এবং সাধারণ অবস্থায় বা একটু গরম করে পিটিয়ে মানুষ তা থেকে নানা উপকরণ তৈরী করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে, মুক্ত অবস্থায় লোহা কদাচিৎ দেখা যায়। লোহাকে পিটিয়ে নরম করে বিভিন্ন রূপ দিতে সেটাকে লোহিত-তপ্ত অবস্থায় রাখতে হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব ব্যবস্থাপনা করতে বেশ দীর্ঘ সময় লেগেছে।

পুরাকালে প্রথম কোথায় লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা নিয়ে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। এখন প্রায় সবাই একমত হয়েছেন যে এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্কের পূর্বাঞ্চল) হিট্টাইটরাই সর্বপ্রথম আকরিক থেকে লৌহ উৎপাদন চালু করেছিল। হিট্টাইটরা আরমেনিয়ার ককেসাস্ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে এশিয়া মাইনরে এসে বসতি এবং রাজ্য স্থাপন করে। এদের মধ্যে অনেক দক্ষ ধাতু কর্মী ছিল। ককেসাসে উন্নত তামা ও কাংস্য শিল্পে তাদের প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। এশিয়া মাইনরে এসে তারা প্রচুর লোহার খনিজ দেখতে পেল এবং স্বল্প আয়াসেই সেই খনিজ থেকে লোহা তৈরী করতে সমর্থ হল। সেটা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের কথা, তারপরে আরও দুই-তিন শতক লেগেছিল কাঁসাকে হটিয়ে দিতে। সাধারণতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১২৫০ অব্দ থেকে লৌহ যুগের শুরু মনে করা হয়।

হিট্টাইটদের আবিষ্কারের কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই কিন্তু লোহার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল। মহাকাশ থেকে প্রায়ই ছোট বড় অনেক উল্কাপিণ্ড এসে পৃথিবীর বুকে পড়ে। সেই সব পাথরের মধ্যে অনেকটা লোহা থাকে; কখনও কখনও উল্কাখণ্ডের প্রায় সবটুকুই অবিমিশ্র লোহা। প্রস্তর যুগের মানুষ সেই লৌহপিণ্ড থেকে ছিল্‌কা নিয়ে ছুরির ফলার মতো ব্যবহার করত, সেরকম প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্বর্গ থেকে আসা ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ এই লোহা তখন ছিল অতি মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু। মিশরের অতি প্রাচীন কবর থেকে নীল পাথরের গুটি ও লোহার পুঁতি দিয়ে গাঁথা হার পাওয়া গেছে। একটি পিরামিডের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দের পুরানো লোহার যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। ক্রীটের কনসস্ রাজ্যের সমাধিতে ৩৮০০ বছরের পুরানো লোহার জিনিসের সন্ধান মিলেছে—এসব লৌহ-বস্তু অবশ্যই উল্কা-জাত।

এশিয়া মাইনরে লৌহ-শিল্প আরম্ভ হওয়ার স্বল্পকাল মধ্যেই সেটা সারা মধ্যপ্রাচ্যে—প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, সুমের, ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

এশিয়া মাইনরে পোড়ামাটির পাটাতে উৎকীর্ণ কতকগুলি দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে, কোন কোন পাহাড়ে লোহার খনিজ আছে, কোন কোন রাজা লোহা দান করেছে, ইত্যাদির তালিকা আছে। একটি পাটা থেকে জানা গেছে, অ্যাসিরিয়ার রাজা হিট্‌টাইট রাজাকে লোহা পাঠাতে অনুরোধ করেছে, তার উত্তরে হিট্‌টাইট রাজা একটি সম্মানসূচক লোহার ছোরা পাঠিয়ে জানাচ্ছে যে লোহা আপাততঃ নেই, তৈরী হলেই অ্যাসিরিয়াকে পাঠান হবে।

খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দে ইউরোপের দানিয়ুব উপত্যকা থেকে দুর্ধর্ষ কেল্ট, ডোরিয়ান জাতিরা এসে এশিয়া মাইনর আক্রমণ করে এবং অনেক হিট্‌টাইটকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এই সকল বন্দী হিট্‌টাইটদের মাধ্যমেই প্রধানতঃ লৌহবিদ্যা গ্রীস, ইতালী, অস্ট্রিয়া প্রভৃতিতে বিস্তারিত হয়। বস্তুতঃ এই সময় ইউরোপে লৌহ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয় এবং ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। খ্রীঃ পূঃ ১১০০ নাগাদ গ্রীসের মাধ্যমে ক্রীট দ্বীপ পর্যন্ত লোহার ব্যবহার প্রসারিত হয়।

মিশরে লৌহ খনিজ প্রায় নেই, সুতরাং সেখানে প্রথম দিকে লোহার জিনিস-পত্র আমদানী করা হত। খ্রীঃ পূঃ ৮০০-এর পরে মিশরে লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। খ্রীঃ পূঃ ১২৫০-এ মিশর রাজ হিট্‌টাইট রাজাকে লৌহ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেন। তার উত্তরে হিট্‌টাইট রাজ মিশরের রাজাকে লোহার তলোয়ার পাঠিয়ে তার পরিবর্তে সোনা পাঠাতে অনুরোধ করেন, কারণ মিশরে তো সোনা ধুলোর মতোই ছড়িয়ে রয়েছে। এই চিঠিগুলির পাণ্ডুলিপি আজও রয়েছে।

আনুমানিক শতকরা একভাগ কার্বন নিষিক্ত লোহার নাম ইস্পাত। ইস্পাতের অনেকগুলো বিশিষ্ট গুণ আছে, যা বিশুদ্ধ লোহাতে নেই। যেমন, ইস্পাত অনেক বেশী ঘাতসহ ও কঠিন, ইস্পাত উচ্চ তাপমাত্রায় বেশী নমনীয়; ইস্পাতের অস্ত্র বেশী ক্ষুরধার ইত্যাদি। বর্তমান কালে অধিকাংশ লোহাকেই ইস্পাতে পরিণত করা হয়। খ্রীঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের গোড়ার দিকেই সিরিয়া, অস্ট্রিয়া, গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চলে খুব উন্নত ধরণের ইস্পাত যথেষ্ট তৈরী হত। সে রকম ইস্পাত আধুনিক যুগের পদ্ধতিতে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে করা সম্ভব হয়েছে।

লৌহের ইতিহাসে আর একটি বিস্ময়কর সংবাদ রয়েছে। মাত্র দুই দশক পূর্বে (১৯৬০) নৃতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেছেন আফ্রিকার টানজানিয়া অঞ্চলের হায়া উপজাতির লোকেদের আজ থেকে দু'হাজার বছর আগেই খুব ভাল ইস্পাত

তৈরী করার কৌশল জানা ছিল। মানুষ সমান উঁচু চুল্লীর নীচের গর্তে ঘাসের উপরে আকরিক রেখে কাঠ দিয়ে ঢেকে নিয়ে উত্তপ্ত করা হত। তারপর চারদিক থেকে আটটি বড় হাপরের সাহায্যে চুলার অভ্যন্তরে জোরে বায়ু চালানো হত। এই ভাবে উচচ উষ্ণতার সৃষ্টি করে গলিত ইস্পাত তৈরী হত। এই ধরনের চুলার ধ্বংসাবশেষ টানজানিয়ায় অনেকগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই খ্রীষ্টজন্মের সময় থেকে প্রায় ১৮০০ বছর ধরে হায়ারা এই ভাবেই ইস্পাত তৈরী করে এসেছে।

# ২

## প্রাচীন ভারতের ধাতু শিল্প

পুরাকালের ভারতের লোকেরাও ধাতুবিদ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং পারদর্শিতার প্রমাণ রেখে গিয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা বলতে আমরা 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতাই' মনে করি। সেই সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫০ অব্দ থেকে। তারপর সহস্রাধিক বছরেরও বেশী ধরে সিন্ধু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগার তীরে এই সভ্যতার আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ সেই সভাতা তাম্র-কাংস্য যুগের। ১৯২১ সালে দয়ারাম সাহানী হরপ্পাতে এবং ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদারোতে খনন করে প্রাচীন কালের বহু জিনিসের সন্ধান পান। এর পরে জন মার্শাল, ই ম্যাকে, ননী-গোপাল মজুমদার, কাশীনাথ দীক্ষিত প্রভৃতি পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বেলুচিস্থানের নানা জায়গায় খনন করে সেই যুগের সভ্যতার আরও বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেন। স্থাপত্যে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থায়, শিল্পকলায়, পরিকল্পনায় পুরাকালের সভ্যতার যে প্রমাণ রয়েছে সেটা অনেকদিকেই বর্তমান অতি-আধুনিক যুগের সঙ্গে তুলনীয়। মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পাই ঐ প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

আমাদের আলোচনা ধাতু নিয়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে সোনা, রুপা, তামা, কাঁসা, পিতল আর সীসার নানা প্রাচীন জিনিস পাওয়া গেছে। সোনার হার, কানের গয়না ও অন্যবিধ অলঙ্কার উদ্ধার করা হয়েছে। সোনা আসত মহীশূরের কোলার এবং মাদ্রাজের অনন্তপুর থেকে। ওখান থেকে পাওয়া সোনার অলঙ্কারে যে রুপার খাদ রয়েছে, সেই পরিমাণ খাদ দাক্ষিণাত্যের সোনাতেই দেখা যায়। সেই জন্য সেখান থেকে সোনা আসত বলে মনে হয়। তাছাড়া, সিন্ধু-সৈকতের বালু থেকে অবশ্য সোনা বা হিরণ্য সংগ্রহ হত। ঋক্-বেদে সিন্ধুনদের নাম "হিরণ্যয়ী"।

সোনার চেয়েও বেশী রুপোর জিনিস সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। রুপার অলঙ্কার, বাসন, নানা আকারের পাত্র, কারুকার্যময় ঘট, ফুলদানী ইত্যাদি পাওয়া গেছে। রুপা অবশ্যই বাইরে থেকে আনা হত, খুব সম্ভবতঃ আর্মেনিয়া,

ইরান থেকে আসত। সেই যুগে সিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে চতুর্দিকের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। সার্থবাহদের নানা পথ নানা দিকে গিয়েছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতু এবং সম্ভবতঃ শিল্পীরাও সার্থবাহদের সঙ্গে ভারতে এসেছে। এটা খুবই সম্ভব, অনেকক্ষেত্রে ভারতের শিল্পীরাও সুমের ও অন্যান্য দেশে তাদের বিদ্যা নিয়ে গিয়েছে।

সোনা-রূপার অলঙ্কারগুলির কারুকর্ম দেখে মনে হয়, সেই যুগের ধাতু-শিল্পীরা সূক্ষ্মকাজে বিশেষ দক্ষ ছিল। এই সকল অলঙ্কার সম্বন্ধে পুরাবিৎ মার্শাল বলেছেন ; "...so well finished and so highly polished that they might have come out of a Bond street jeweller's of today rather than from a prehistoric house of 5000 years ago."

তামা, কাঁসা এবং পিতলের বহু বাসন ও অন্যান্য জিনিষ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার নীচের স্তরে পাওয়া গেছে। একটি ছোট প্রকোষ্ঠে অনেকটা পরিমাণ তাম্র-আকরিকও রয়েছে ; অদূরেই একটি তাম্র-পিণ্ড পাওয়া গেছে। সেইজন্য মনে হয়, সেখানে তামা প্রস্তুত করে পিটিয়ে এবং ঢালাই করে নানা উপকরণ তৈরী করা হত। নিকটবর্তী পশ্চিমের পাহাড় থেকে তামার আকরিক সংগ্রহ হয়েছে ; রূপা, টিন, সীসা, এসব আসত আফগানিস্থান এবং উত্তরাঞ্চল থেকে। তামা ও কাঁসার তৈরী বর্শা, তীর, কুড়াল, দা, বঁড়শি, বালা, আংটি এসব তৈরী করেছে কর্মকারেরা। যুদ্ধের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতিগুলো প্রায়ই কাঁসার তৈরী। ৪৫ সেণ্টিমিটার লম্বা তামার তলোয়ার মহেঞ্জোদারো থেকে উদ্ধার করা গেছে। কোন লোহার জিনিস পাওয়া যায় নি। সিন্ধু সভ্যতার কালে ওখানে লোহার প্রচলন হয়নি। সীসার জিনিসও অল্পই পাওয়া গেছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে কাঁসার দাঁত বিশিষ্ট ৪২ সেণ্টিমিটার লম্বা একটি করাত পাওয়া গেছে। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, কেন না প্রচলিত ধারণা ছিল, রোমকদের পূর্বে করাতের ব্যবহার কেউ জানত না। কাঁসার তৈরী মালসা, হাঁড়ি, কলসী, থালা, কড়াই এসব অনেক পাওয়া গেছে। কাঁসার দর্পণ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ঢালাই করা কাঁসার একটি অপরূপ সুন্দর নর্তকীর মূর্তি উদ্ধার হয়েছে। এর গঠন-বৈচিত্র্য সেদিনের শিল্পকারদের কল্পনা ও প্রতিভার অক্ষয় সাক্ষ্য।

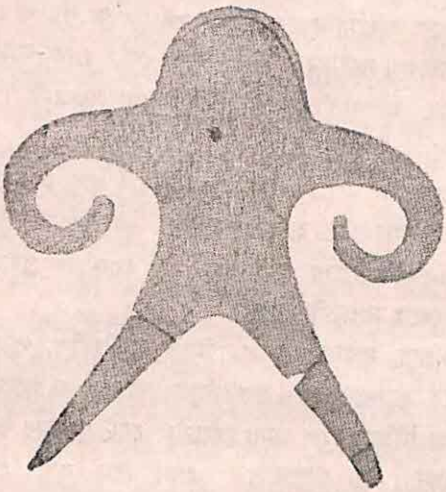
আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। সিন্ধুনদের প্রায় দেড়শ কিলোমিটার পশ্চিমে বেলুচিস্থানের নীল-উপত্যকায় এবং দক্ষিণ বেলুচিস্থানের কোলাঁ অঞ্চলের কুল্লীতে প্রাক্-হরপ্পা যুগের কৃষ্টির নির্ভরযোগ্য নিদর্শন রয়েছে। নীল-উপত্যকায় তামার কুড়াল, বাটালি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। কুল্লীতে হাতল-বিশিষ্ট দশ-সেণ্টিমিটার ব্যাসের তামার দর্পণ,

কয়েকটি তামার পিন, তামার বালা ও তামার মালসার ভগ্নাংশ উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণার পর বোঝা গেছে, এসব জিনিষ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের। সে সময় এই বেলুচি-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যোগাযোগ ছিল। শেষের দিকে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের পরে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বালুচীদের সংযোগ ঘটেছিল। যাইহোক, সেই প্রাক্-মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার কালে বেলুচিস্থানের অধিবাসীরা তামা উৎপাদনে সক্ষম ছিল। তবে তা'রা ঢালাই করতে জানত না, পিটিয়ে উপকরণ তৈরী করত।

হরপ্পার কতকগুলি তামার জিনিসে সীসার খাদ রয়েছে। রাজপুতানা এবং হাজারীবাগ অঞ্চলের তাম্র আকরিকগুলিতে অনুরূপ সীসা মিশ্রিত। তাই থেকে মনে হয় সিন্ধু-সভ্যতার তামা বা তার আকরিক প্রধানতঃ বেলুচিস্থান এবং রাজপুতানা থেকে সংগৃহীত হত।

মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া মাইনর, গ্রীস, মিশর, ক্রীটদ্বীপ, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশে দীর্ঘদিন ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও গবেষণা করে প্রাচীন কালের অনেক তথ্য নিশ্চিতরূপে জানা গেছে। সেই তুলনায় ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এখন মাত্র উষাকাল। এখন মনে করা হচ্ছে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সভ্যতা যে শুধু সিন্ধুতীরেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। খুব সম্ভবতঃ গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত উত্তর ভারতে বহুদূর পর্যন্ত সেটা পরিব্যাপ্ত ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় তামার তৈরী পুরাকালের মাছ ধরার ও চাষ করার উপকরণ পাওয়া গেছে। যথেষ্ট ভারী তামার কুড়াল সেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ১৮২৯ সালে টি, উইলিয়ামস্ উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাধের কাছে ফতেগড়ের মাটির তলা থেকে তেরটি অতি প্রাচীন তামার জিনিস উদ্ধার করেন। সেগুলো এখন কলকাতার যাদুঘরের সম্পত্তি। এই বস্তুগুলির মধ্যে মনুষ্য আকারের একটি তাম্র মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি চ্যাপ্টা, পা দুটি ফাঁক করা, হাত দুটি গোল হয়ে রয়েছে। মাথাটা অবনমিত এবং বেশ ভারী (চিত্র ৬)। হাতের এবং পায়ের বাইরের দিকটা পাতলা এবং বেশ ধারালো। বস্তুটির ওজন দুই কিলোগ্রামের উপরে। লম্বায় উপর থেকে নীচে ৬৫ সেন্টিমিটার, কিন্তু খর্বকায় পা-টি ৫১ সেন্টিমিটার। প্রথমে ঢালাই করে নিয়ে পরে পিটিয়ে মূর্তিটি তৈরী করা হয়েছে। এরকম মূর্তির তাৎপর্য ঠিক বোঝা যায় নি। ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেছেন—তামার এই মানবোপম মূর্তিটি কোন ধর্মীয় প্রতীক বা দেবমূর্তি। আবার কোন কোন পুরাবিজ্ঞানীর মতে এটি একটি হাতিয়ার। ছুঁড়ে দিয়ে বড় বড় বন্য পাখীকে ঘায়েল করার জন্য এটি ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা

হত। গত দেড়শ বছরে ঐ উত্তরপ্রদেশের কানপুর অঞ্চল থেকে মোট আরও সাতটা অনুরূপ ছোট বড় মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে। এসব থেকে মনে



চিত্র ৬। গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় পাওয়া তামার নরোপম মূর্তি

হয়, গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাম্র-শিল্পের প্রচলন ছিল আজ থেকে অন্ততঃ সাড়ে চার হাজার বছর আগে।

কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশে নয়, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার গাঙ্গেরিয়াতে মাটির নীচে একটি গর্ত থেকে একত্রে উদ্ধার করা হয়েছে ৪২৪টি তামার যন্ত্র এবং ১০২টি রূপার পাত। তামার যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ কুড়াল, কোদাল, বাটালি ইত্যাদি। এছাড়া বিহারের মানভূম জেলাতে ২৭-টি এবং রাঁচি জেলায় ২১-টি কুড়াল পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জের একটি গ্রামে ছিল সেই প্রাচীন যুগের দশটি দ্বিমুখী কুড়ালের যুদ্ধাস্ত্র। এই বস্তুগুলির একত্র অবস্থান থেকে অনুমান করা হয়েছে—পশ্চিম থেকে বর্বরজাতি এসে যখন সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তখন বহু শরণার্থী নিশ্চয়ই ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে এসেছিল। তাদের সঙ্গেই এই তামার জিনিস এসেছিল, পরে হয়ত তারাই স্থানীয় অধিবাসীদের ধাতুর কাজ শিখিয়েছিল।

সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তির পর বেশ কয়েক শতক পর্যন্ত ভারতে ধাতুবিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের বা ধাতুকর্মের উন্নতির কোন প্রমাণ নেই। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি এক সময়ে আর্যরা এসে প্রথমে পশ্চিম ভারতে এবং পরে

সারা উত্তর ভারতে বসবাস শুরু করে। অবশ্য এই তারিখ নিয়ে মতান্তর আছে। আর্যদের সমাজ ছিল প্রধানতঃ পশুপালন এবং কৃষিনির্ভর। কিন্তু নিজেদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর এবং ভারতের তৎকালীন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধ-বিবাদ লেগে থাকত। সেই যুদ্ধে তারা কাঁসার অস্ত্রশস্ত্রই ব্যবহার করত। আর্যদের তথা হিন্দুদের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ঋক্‌বেদ। এই ঋক্‌বেদে সোনা রূপা তামা কাঁসার উল্লেখ আছে কিন্ত লোহার কোন উল্লেখ নেই। অর্থাৎ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে অন্ততঃ আর্যদের লোহার সঙ্গে পরিচয় হয় নি। ঋক্-বেদের অনেক সূক্ততে অয়স্ শব্দের উল্লেখ আছে। অনেকে সেটাকে লোহা বলে মনে করেন। বস্তুতঃ "অয়স" শব্দটি যে-কোন ধাতুর সাধারণ নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বৈদিক যুগেরই পরবর্তীকালে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে রচিত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে লোহা বেশ সুপরিচিত। সেখানে তামা এবং লোহাকে লোহিতায়স এবং কৃষ্ণায়স বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এর অনেক আগেই মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে লৌহযুগের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। ভারতে লৌহ-উৎপাদন আরম্ভ হয় খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতক থেকে এবং খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে ইস্পাতও প্রস্তুত করা হত। এই সময় ভারতে কেবলমাত্র লোহা নয়, অন্যান্য সব ধাতুর উৎপাদন হত এবং নানা শিল্পকর্মে সেগুলির ব্যবহারের বিশেষ প্রসার ছিল। মৌর্য-যুগের চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"এর বিশদ বিবরণ রয়েছে (খ্রীঃ পূঃ ৩২১-২৯৬)।

বিভিন্ন ধাতুর কি কি খনিজ প্রকৃতিতে রয়েছে এবং কোথায় সেগুলো পাওয়া যায়, খনিজগুলো কিরূপ এবং কি উপায়ে তাদের চেনা যায়, কোন খনিজে ধাতুর পরিমাণ বেশী, এ সবের বিশদ বর্ণনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে। খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করার বিভিন্ন ব্যবস্থা, ধাতুগুলির বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ও ব্যবহার ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখও আছে। বহু রকমের ধাতুসংকরের সৃষ্টি ও তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ করে বলা হয়েছে। ধাতুর শিল্পকর্মের বিষয় নিয়ে নানা তথ্য দেওয়া আছে অর্থশাস্ত্রে। যেমন, কৌটিল্য বলছেন: শিল্পকর্মের সোনা ত্রিবিধ; "ক্ষেপন, গুণ এবং ক্ষুদ্র"। ক্ষেপন অর্থাৎ যে সোনাতে মণি বা কাচ প্রযুক্ত করা যায়। "ক্ষেপনের" সোনা পাঁচ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সঙ্গে দুইভাগ তাম্র-মিশ্রিত ধাতু-সংকর মিশিয়ে তৈরী হয়। এই ধাতু-সংকরে সোনা : তামা — ২ : ১ অনুপাতে থাকবে। খুব সরু তার তৈরী করার জন্য যে সোনা উপযুক্ত তাই হচ্ছে "গুণ" সোনা। আর বালা, আংটি ইত্যাদি অলঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত সোনা হল "ক্ষুদ্র"। সোনার

গিল্টির কাজ, সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়ার কাজ, ঢালাইয়ের পদ্ধতি, ঝালাইয়ের নিয়ম ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে কৌটিল্যের গ্রন্থে। স্বর্ণকার নিকৃষ্ট ধাতু মিশিয়ে সোনা অপহরণ করেছে কিনা সেটা পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বিবৃত রয়েছে। খনির অধ্যক্ষের এবং ধাতুবিদদের কি কি গুণ এবং অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন কৌটিল্য তারও নির্দেশ দিয়েছেন। সে যুগে ধাতুবিদ্যা যথেষ্ট উন্নত না হলে এরূপ বিশদ বর্ণনা অর্থশাস্ত্রে কখনও স্থান পেত না।

বৌদ্ধযুগে এবং তারপরে হিন্দু যুগে—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ থেকে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ—ভারতবর্ষে ধাতু-উৎপাদন এবং ধাতু শিল্পে বিশেষ উন্নতি সাধনের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সে সব প্রমাণের মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

নেপাল সীমান্তে রামপুরা অশোকস্তম্ভের পাদদেশে ১৮৮১ সালে মিঃ গেরিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের তৈরী একটি উৎকৃষ্ট তামার বল্টু পান। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪½ ইঞ্চি এবং পরিধি ১৪ ইঞ্চি। কলকাতার যাদুঘরে এটি এখন রয়েছে। স্তম্ভের সঙ্গে শিলালিপি সংযুক্ত করে দেওয়ার জন্য বোধ হয় এটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

বিহারের সুলতানপুরে এক বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ থেকে বিশুদ্ধ তামার তৈরী ৭½ ফিট উঁচু একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে (১৮৬৪)। এটি এখন বার্মিংহাম যাদুঘরে রক্ষিত। এই মূর্তির কাছে অনেকটা তাম্র-আকরিকও পাওয়া গেছে এবং আরও দুইটি ছোট ছোট বুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গেছে। তাছাড়া, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের একটি মুদ্রাও সেখানে ছিল। মূর্তিটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকের। মনে হয় ঐখানেই তামা উৎপাদন করে মূর্তি ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছিল।

শিশুপালগড়ের ও বানগড়ের খনন থেকে এবং সুলতানপুরের ধ্বংসস্তূপ থেকে অনেক তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা (কিছু কিছু পিতল ও কাঁসার মুদ্রাসহ) পাওয়া গেছে। এগুলো মৌর্য, কুশান এবং গুপ্তসম্রাটদের সময়ের রাজকীয় মুদ্রা। ছোট ছোট পোড়ামাটির মুচিতে তামা গলিয়ে নিয়ে ঢালাই করে এসব মুদ্রা তৈরী হত। সেই সব মুচিও অনেক পাওয়া গেছে।

তাম্রপত্র বা প্লেট বহু যুগ থেকেই ভারতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেদিনের রাজারা তামার পাতে খোদাই করে ভূমির দানপত্র ব্রাহ্মণদের দিতেন। মৌর্যযুগের এ রকম তামার দানপত্র একাধিক স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলো অন্ততঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের। হিন্দুরা তামাকে খুব পবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বণে তামার বাসনপত্রের ব্যবহার অনেক প্রাচীনকাল থেকে আজও পর্যন্ত প্রচলিত।

আজ থেকে অন্ততঃ দু'হাজার বছর আগেই ভারতে খনিজ থেকে তাম্র উৎপাদন একটা বড় শিল্প ছিল। আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশন করে নিলে একটা কঠিন ধাতুমল (slag) পড়ে থাকে। ভূতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন, সিংভূম, হাজারীবাগ, রাজস্থানের অনেক জায়গায় এই ধাতুমল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে এসব স্থানে তামা উৎপাদন করা হয়েছিল। এ ছাড়া সিকিম, কুমায়ুন, গাড়োয়াল, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থানেও তাম্র-খনিজ পাওয়া যেত এবং সেখান থেকে তামা নিষ্কাশন করা হত।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি লিখে গেছেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের কাছে ছয় তলার সমান ৮০ ফিট উঁচু একটি তামার তৈরী দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি ছিল। এটি সম্রাট পূর্ণবর্মের সময়ের ( সপ্তম শতক ) তৈরী। এই বিশাল মূর্তিটির জন্য কী প্রচুর তামা তৈরী করে নিতে হয়েছিল! পরে কোন কারণে এই মূর্তিটি ধ্বংস হয়েছে, এখন তার কোন চিহ্ন নেই। হুয়েন সাঙ আরও বলেছেন, হর্ষবর্ধনের সময় নালন্দার অদূরেই একটি বিহার কাঁসা দিয়ে তৈরী করা শুরু হয়েছিল, কিন্তু সেটা অসমাপ্ত ছিল।

কাঁসা ও পেতল, এই দুই তাম্রসংকরও সেই যুগে অপর্যাপ্তভাবে ব্যবহৃত হত। আয়ুর্বেদ সংহিতা সুশ্রুতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পানীয় জল কাংস্য পাত্রে রাখতে হবে। গৃহকাজের নানা পাত্র, বাসন, ঘণ্টা ইত্যাদি কাঁসা থেকে তৈরী করা হত। মাদ্রাজের তিনেভেলীর খনন থেকে নানা রকমের সুন্দর কারুকার্যময় কাংস্য বস্তু, পেয়ালা, অলঙ্কার, ছাকুনি, নল ইত্যাদি পাওয়া গেছে—এদের নির্মাণ ৩০০-৪০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে। অষ্টম এবং নবম শতকে কাঁসার ঢালাইয়ের কাজে বঙ্গদেশের ধাতুবিদেরা সবিশেষ দক্ষ ছিলেন।

তক্ষশিলার স্তূপের খনন থেকে অসংখ্য ধাতব বস্তু সংগৃহীত হয়েছে। প্রচুর সোনা ও রূপার অলঙ্কার সেখানে রয়েছে, তারমধ্যে মণি-বসান বা তারের কাজও রয়েছে। এ ছাড়া পাওয়া গেছে তামা, কাঁসা, পেতল ও সীসার নানা রকমের দ্রব্য, গৃহকর্মের জিনিস, শল্যচিকিৎসার সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি। এমনকি, সীসা ও রাং মিশ্রিত ঝালাইয়ের সংকর ধাতুও পাওয়া গেছে। এর অনেকটাই খ্রীষ্টজন্মের ৬০০।৭০০ বছর পূর্বের। এসব থেকে স্পষ্ট যে খ্রীষ্টজন্মের পূর্ববর্তী সহস্র বছরের মধ্যেই ভারতে অতি উচ্চমানের ধাতু শিল্প দেখা দিয়েছিল।

এবার লোহার কথায় আসা যাক। কুতুবমিনারের পাশে যে লৌহস্তম্ভটি রয়েছে সেটা তৈরী হয়েছিল চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতনার রাজা চন্দ্রবর্মনের বিজয় চিহ্ন হিসাবে। স্তম্ভটির উচ্চতা ২৪ ফিট, ব্যাস প্রায় ১৫ ইঞ্চি এবং ওজন ছয়

টনেরও বেশী। আশ্চর্যের কথা গত দেড় হাজার বছরেও এই বিশাল স্তম্ভটির কোথাও একটুও মরচে পড়েনি। জল, রোদ, বৃষ্টিতে এর কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি। এর কারণ, স্তম্ভটি বিশুদ্ধতম লোহা দিয়ে তৈরী, অন্য কোন ধাতব খাদ নেই। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এর লোহার ভাগ ৯৯·৭২%, কার্বন ০·০৮%, সালফার ০·০০৬%, ফসফরাস ০·১১৪%। এত পরিমাণে এ ধরনের বিশুদ্ধ লোহা বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের যুগেও তৈরী করা সুকঠিন। কি করে এরকম বিশুদ্ধ লোহা সেই প্রাচীন যুগে তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। টাটার মত কারখানা তো তখন ছিল না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছোট ছোট (এক মণ) লোহার পিণ্ড তৈরী করে নিয়ে পরে সুনিপুণভাবে ঢালাই করে জুড়ে এই বিশাল স্তম্ভ তৈরী হয়েছে। অতি নিপুনতার সঙ্গে এমন মসৃণ ভাবে পিণ্ডগুলি জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে উপর থেকে বোঝাই যায় না। অর্থাৎ এই অতি উন্নত কৌশল সে যুগের শিল্পীদের জানা ছিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় লিখেছেন ঃ

"Expert observers of all classes are of opinion that this pillar presents an indisputable and permanent record of marvellous metallurgical skill and engineering ability of the ancient Indian workers, which can reasonably claim unstinted admiration even of our present time."

কিন্তু এই স্তম্ভ নির্মাণের আরও কয়েক শতাব্দী আগেই এ দেশে লৌহ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। তিনেভেলী, বানগড়, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানের খনন থেকে লোহার তৈরী প্রচুর জিনিস ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ছোরা, তরোয়াল, বর্শা, বল্লম, তীর, ত্রিশূল, কোদাল, কুপী, আংটা ইত্যাদি। এগুলোর অনেকটা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের ; আবার অনেক জিনিস কুষাণ ও গুপ্তযুগের। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভুবনেশ্বরের মন্দির তৈরী করতে যথেষ্ট লোহার কড়ি, বরগা ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধু লোহা নয়, প্রাচীন ভারতে খুব উন্নতমানের ইস্পাতও প্রস্তুত করা হত এবং তা আফ্রিকা ও ইউরোপে রপ্তানি করা হত। ভারতীয় ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা ছিল। যে দামাস্কাস ছোরার খ্যাতি সারা বিশ্ব জুড়ে সেটা এই ভারতীয় ইস্পাত থেকেই তৈরী হত। কথিত আছে, অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারকে পুরু ১৫ সের ওজনের একটি উৎকৃষ্ট ইস্পাত দণ্ড দিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন। ভারতীয় ইস্পাত তখন অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ইস্পাতে পান দেওয়া এবং তার কোমলায়নের কলাকৌশলে ভারতীয় লৌহ শিল্পীরা ছিলেন

অদ্বিতীয়। এইজন্য এঁরা সর্বত্র খুবই শ্রদ্ধা এবং সম্মান পেতেন। এই শিল্পকলা ভারত থেকে প্রথমে পারস্যে এবং সেখান থেকে আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হল, সেই কালটিকে ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণ যুগ মনে করা হয়। খ্রীষ্টজন্মের ৬।৭ শো বছর আগের থেকে খ্রীষ্টজন্মের পরে ৭।৮ শো বছর পর্যন্ত—এই কালটিতে ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিল। শুধু কারুকলা, শিল্প-কর্মে নয়, দর্শনে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, সর্বক্ষেত্রে ভারত তার প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে সেই যুগে। এ যুগের অতি প্রত্যুষে আমরা পেয়েছি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত, বাল্মীকির রামায়ণ, এ যুগের প্রভাতকালেই এল কপিলের সাংখ্য, কণাদের বৈশেষিক, এলো আরও সব উপনিষদ, ঈশোপনিষদ, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি। এ যুগের মধ্যাহ্নে উপস্থিত হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র; এ যুগেরই অপরাহ্নে উপস্থিত হলেন কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, শূদ্রক আর তাঁরা দিয়ে গেলেন মেঘদূতম্, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মৃচ্ছকটিকম্, উত্তর রামচরিতম্ ইত্যাদি। এ যুগেরই গভীর প্রদোষে পেয়েছি অজন্তা-এলোরার অতুলনীয় গুহা চিত্র। সমস্ত আর্যবর্ত তখন উদ্দাম প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর। সেই প্রাণোচ্ছলতা কখনও স্ফুরিত হয়েছে পুরুষপুরে, কখনও তক্ষশিলায়, কখনও নালন্দায়, কখনও পাটলিপুত্রে, কখনও উজ্জয়িনীতে। কিন্তু তারপরে দুই তিন শতকের মধ্যেই সেই গৌরব অস্তমিত হয়ে গেল। মধ্যযুগের ভারতে এল এক অন্ধকারের যুগ।

এই মধ্যযুগটি ছিল অ্যালকেমীয় যুগ, এ সময় তান্ত্রিক সাধনার ছিল বিশেষ প্রাধান্য। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা সেই সময় তান্ত্রিক বিশ্বাস ও পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তখন ভারতে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপে রসায়ন চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মৃতসঞ্জীবনী-সুধা আর পরশপাথর আবিষ্কার, যার সাহায্যে অমর জীবন পাওয়া যাবে আর যার স্পর্শে অপকৃষ্ট ধাতু তৎক্ষণাৎ সোনায় পরিণত হতে পারে। এর ফলে কিছু কিছু নতুন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে নানা রকম জালিয়াতি, কৃত্রিমতা ও কপটতা স্থান পেয়েছিল।

অ্যালকেমী সম্পর্কে ফ্রান্সিস বেকন চাষীর সেই পুরাতন কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন। এক চাষী মৃত্যুর ঠিক আগে তার চারজন অলস পুত্রকে বলে গেলেন, "জমির তলায় আমার ধনরত্ন সব পুঁতে রেখে গেলাম।" বৃদ্ধের মৃত্যুর পর চার ছেলেই রত্নের লোভে সারা জমি খুঁড়ে খুঁড়ে রত্নের সন্ধান করতে লাগল, কিন্তু কোন ধনরত্ন পেল না। কিন্তু সমস্ত জমিটার কর্ষণ হয়ে গেল, আর তার ফলে সেখানে সেবার খুব ভাল ফসল হল। তেমনি অ্যালকেমীবিদরা নানা

প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান করেও কোন পরশপাথর পেল না, কিন্তু তাদের অসংখ্য পরীক্ষার ফলে রসায়নের বহু পদ্ধতি, তথ্য এবং বস্তুর সন্ধান মিলল, যার ফলে পরবর্তী বিজ্ঞান-যুগের রাসায়নিক আবিষ্কারে ও অন্বেষণে প্রচুর সাহায্য হল।

মধ্যযুগের এই পতনের নানা কারণ আছে মনে করা হয়। মনু নির্দেশিত উচ্চ ও নীচ জাতিভেদে পেশা এবং বৃত্তির বিভাগের একটি ফল হল, শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মচর্চা, শাসনাধিকার ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত হল। হাতের কাজ, কারুকর্ম শিল্পকলা এসব হীন (!) কাজ হল নীচজাতের জন্য, ব্রাহ্মণের পক্ষে এসব কাজ অস্পৃশ্য ও অসম্মানের। সুতরাং এই সকল শিল্পকর্ম বংশানুক্রমে শূদ্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে মেধা, স্বাধীন সৃষ্টিমূলক চিন্তা-ভাবনা, গবেষণার উদ্যম ইত্যাদির অভাবের জন্য শিল্পকলার উন্নতি ব্যাহত তো হলই, তাতে অবনতিও দেখা দিল। তদুপরি শাসন এবং অর্থব্যবস্থাও ছিল উচ্চবর্ণের অধিকারে, সেই হেতু এই সব শিল্পকলায় সরকারী সমর্থন ও উৎসাহ ছিল না। সারা দেশে আন্তঃরাজ্যীয় বিবাদ-বিরোধে গৃহযুদ্ধ সতত লেগেই ছিল, শিল্পোন্নতির সে ছিল আর এক অন্তরায়। একাদশ শতকে পুনঃ পুনঃ মুসলমানদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভেই উত্তর ভারতে পাঠানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা—এ সবই ভারতে সে যুগের কৃষ্টির পতনকে সাহায্য করেছে। বহু শিল্পকার পালিয়ে গেছে এবং অনেকে বিনষ্ট হয়েছে, যেমন পরবর্তীকালে ইংরেজ এসে ঢাকার বিখ্যাত মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে দিয়ে অক্ষম করে দিয়েছিল। আমাদের কথা ধাতু নিয়ে। ঐ মধ্যযুগটায় ভারতে ধাতু শিল্পের কোন উন্নতি হয়নি বটে, তবে সেই শিল্প যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা নয়। সাধারণ গতানুগতিকভাবে ধাতুর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অবশ্যই তৈরী হত, হয়ত তার মান নিকৃষ্ট হয়েছিল। সুদক্ষ কারিগরেরও অভাব হয়েছিল। তবে লৌহের ক্ষেত্রে মোগল আমলের একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। এই সময়ে ভারতে বিশাল সব কামান তৈরী হত। ভারতে সম্রাট বাবরই প্রথম কামান ব্যবহার করেন। কিভাবে ছাঁচে ঢালাই করে বড় বড় কামান তৈরী করা হত তার বিস্তৃত বিবরণ বাবর লিখে রেখে গেছেন। পরে লোহার বদলে পেতল দিয়েও অনেক বড় বড় কামান তৈরী হয়েছে মোগল যুগে। সে সময়ের সব চেয়ে বড় কামান ছিল—"মালিক-ই-ময়দান", ব্রোঞ্জের তৈরী ১৪ ৩" দীর্ঘ এবং ৪ ১০" পরিধিবিশিষ্ট। ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেদনগরে সুলতান বারহাম্ নিজাম শাহ এটা তৈরী করিয়েছিলেন। আগ্রার বিখ্যাত পিতলের কামানটিরও দৈর্ঘ্য ১৪ ফিট আর ওজন ১৪৬৯ মণ। আগ্রার দুর্গের বাইরে যমুনার তীরে এটা বসান ছিল। ইংরেজরা পরে দুর্গ অধিকার করে ৮৬টি লোহার এবং ৭৬টি পেতলের কামান

হস্তগত করে, তার মধ্যে ঐ কামানটিও ছিল। ঢাকা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সে যুগের অনেক কামান ছিল। ঢাকার বিশাল কামান ছিল "কালু-খাঁ"-এর ওজন ছিল ত্রিশ টনেরও উপরে। বিজাপুরের কামান "লন্ড-কেশব", মুর্শিদাবাদের কামান "জাহান-কোষা", এসব বিখ্যাত কামান। এই সব বিশাল কামান তৈরী করতে যে যান্ত্রিক কৌশল ও নিপুণতা প্রয়োজন সেটা সে যুগের ভারতীয়েরা জানতেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

ইউরোপেও মধ্যযুগে সংস্কৃতির পথে একটা নির্জীবতা ও নিশ্চলতা দেখা দিয়েছিল এবং রেনেসাঁস পর্যন্ত চলেছিল। রেনেসাঁসের ফলে বহু মনীষীর অবদানে ইউরোপে নতুন চিন্তাধারা ও কর্মকুশলতার বিকাশ ঘটে, এবং এক নতুন সভ্যতার পথ খুলে যায়। গ্যালিলিও, নিউটন, রামফোর্ড, বয়েল, ফ্যারাডে, ডালটন প্রভৃতির অভ্যুদয়ে বিজ্ঞান জগতে এক বিরাট পরিবর্তন হয় এবং পৃথিবী নতুন এক বিজ্ঞানযুগে প্রবেশ করে। কিন্তু ভারতকে এই নতুন চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

৩

# আধুনিক বিজ্ঞান যুগ ঃ ধাতু উৎপাদন

প্রধানতঃ যে সকল বস্তুর ব্যবহারের উপর নির্ভর করে সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছিল, প্রাচীনকালটিকে আমরা সেইভাবে ভাগ করে নিয়েছি—প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, কাংস্য যুগ এবং সবশেষে এসেছে লৌহ যুগ। এই বিচারে অবশ্য বলতে হয় লৌহ যুগ এখনও চলছে, কারণ এখনকার এই উন্নত সভ্যতায়ও আমাদের অধিকাংশ প্রয়োজনে লোহা অপরিহার্য।

কিন্তু গত দুই শতকে পরীক্ষা পদ্ধতির অবলম্বনে এবং যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের প্রয়োগে আমাদের বিজ্ঞান-চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে এবং অভাবনীয় নানা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। এই দুশো বছরের মধ্যে যত বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে, তার এক শতাংশও পূর্ববর্তী দশ হাজার বছরে হয়নি। ফলে, হঠাৎ সভ্যতার এক আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে, যেখানে লোহা ছাড়াও জনকল্যাণে, শিল্পে, যানবাহনে, বিলাস-ব্যসনে, নিত্যপ্রয়োজনে অসংখ্য রকমের বস্তু ব্যবহৃত হচ্ছে। এই জন্য এটাকে আর কেবলমাত্র লৌহ যুগ বলা চলে না। এটা বস্তুতঃ বিজ্ঞান আবিষ্কারের নতুন যুগ। ১৭৮৯-তে ল্যাভয়সিয়র যখন প্রথম প্রমাণ করলেন, প্রজ্বলন ও দহনের মূলে আছে অক্সিজেন আর সেই অক্সিজেনের জন্য প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, সেইদিন থেকেই রসায়নের নবযুগের আরম্ভ।

আধুনিক যুগের রসায়নের একটা গোড়ার কথা হল, পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ রয়েছে। এই কয়টি মৌল থেকেই জড়জগতের উদ্ভব। দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্র সংযুক্ত হয়েই লক্ষ লক্ষ যৌগপদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের চারদিকে যে অসংখ্য বস্তু রয়েছে, সবই ঐ মৌল-গুলির সমন্বয়ে হয়েছে।

এই ৯২টি মৌলের অধিকাংশই (৭২টি) ধাতু আর বাকী কুড়িটি (যেমন, সালফার, কার্বন, অক্সিজেন, ইত্যাদি) অধাতু। ধাতুগুলির প্রধান গুণ হল—এরা তাপ এবং তড়িৎ অনায়াসে বহন করতে পারে। অধিকাংশ ধাতুকেই গলিয়ে নিয়ে বা পিটিয়ে নানা আকার দেওয়া যেতে পারে—পাত বা সরু তার করা যেতে পারে। অধাতুগুলোর এসব গুণ নেই।

ধাতুগুলির মধ্যে বেশীরভাগই পৃথিবীতে অতি সামান্য পরিমাণে আছে অর্থাৎ তারা বিরল। কয়েকটি মাত্র ধাতু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আমাদের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন উপায়ে তাদের ব্যবহার করা হয়। লাঙলের ফলা থেকে উড়োজাহাজ, পেরেক থেকে হাওড়ার পুল, এক পয়সার মুদ্রা থেকে কামান-বন্দুক, কাঁটা চামচ থেকে এক্স-রে যন্ত্র—বর্তমান দুনিয়ার অনেক কিছুই ধাতুর উপর নির্ভর।

খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই মানুষের সঙ্গে সোনা, রূপা, তামা, সীসা, টিন, দস্তা, লোহা—এই কয়টি ধাতুর পরিচয় ঘটেছিল এবং তাদের যথেষ্ট ব্যবহারও হয়েছিল। অ্যালকেমীয় যুগে বা রসসিদ্ধির যুগে আর একটি ধাতু পারদ বা মারকারির ব্যবহার শুরু হয়। বাকী প্রায় চৌষট্টিটি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে এই আধুনিক যুগে। এদের মধ্যে কয়েকটি ধাতু এখন খুবই সমাদৃত—যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, ম্যাগনেসিয়াম, টান্স্টেন, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি এবং এদের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। পৃথিবীতে এসব ধাতু কদাচিৎ স্বাভাবিক বা মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়। অধিকাংশই অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা যৌগরূপে থাকে এবং তা থেকে ধাতুকে নিষ্কাশিত করে নিতে হয়। কয়েকটি ধাতু যেমন লোহা, তামা, কিছুটা মৌলরূপে পাওয়া যায় কিন্তু বেশীর ভাগটাই যৌগরূপে নানা খনিজে থাকে। কোন একটি ধাতুর সব খনিজ থেকেই ধাতুটিকে উদ্ধার করা হয় না। যে সমস্ত খনিজ থেকে সহজে এবং স্বল্প ব্যয়ে ধাতুকে নিষ্কাশন করা সম্ভব, সেগুলিকে ঐ ধাতুর "আকরিক" বলা হয়। যেমন, অ্যালুমিনিয়াম মাটিতে সিলিকেটরূপে প্রচুর রয়েছে, কিন্তু মাটি থেকে ঐ ধাতুকে উদ্ধার করা অতীব দুষ্কর ; সুতরাং মাটি অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক নয়।

সচরাচর বিভিন্ন ধাতু তাদের আকরিকগুলিতে অক্সাইড, সালফাইড, কার্বনেট, ক্লোরাইড যৌগরূপে থাকে। একই ধাতুর অবশ্য একাধিক রকমের আকরিকও হতে পারে ; যেমন দস্তার প্রধান আকরিক সালফাইড (ZnS), কিন্তু ত্যর কার্বনেট আকরিকও ($ZnCO_3$) আছে। প্রয়োজনীয় কয়েকটি ধাতুর প্রধান আকরিকের একটি তালিকা দেওয়া হল।

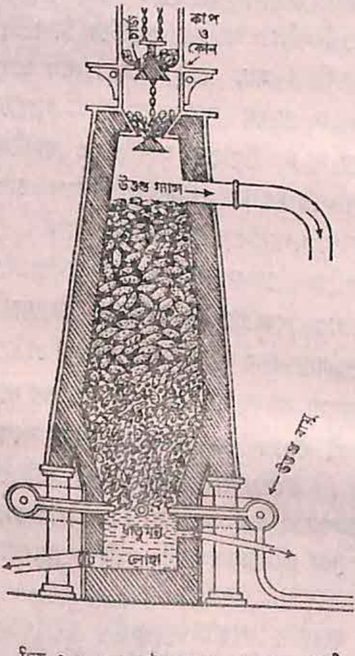
| যৌগ | ধাতু | আকরিক |
|---|---|---|
| অক্সাইড | লোহা | হিমাটাইট ($Fe_2O_3$) |
| | অ্যালুমিনিয়াম | বক্সাইট ($Al_2O_3,2H_2O$) |
| | টিন | ক্যাসিটেরাইট ($SnO_2$) |
| | ম্যাঙ্গানিজ | পাইরোলুসাইট ($MnO_2$) |

লোহার অক্সাইড থেকে এভাবে লোহা তৈরী হয়। বিজ্ঞানীরা সেই বিক্রিয়াগুলিকে লেখেন :

$$Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 2Fe + 3CO$$
$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$$
$$CaO + SiO_2 \rightarrow CaSiO_3 \text{ ( ধাতুমল )}$$

বিগলন প্রক্রিয়ার জন্য নানা রকমের চুল্লী ব্যবহৃত হয়। এদের দু-তিনটির কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

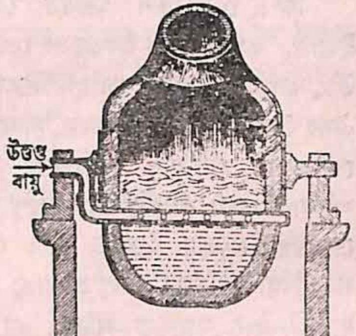
১। মারুত-চুল্লী (Blast Furnace) : মারুত চুল্লী খুব উঁচু চিমনির মত ; ৫০-১০০ ফিট উঁচু। মাঝখানটা চওড়া আর সেখান থেকে উপরে ও নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে ( চিত্র ৭ )। মাঝখানের প্রশস্ত অংশের ব্যাস ১৫-২০ ফিট। আকরিক, কোক এবং বিগালকের মিশ্রণ চুল্লীর উপরের প্রবেশ-পথ দিয়ে অভ্যন্তরে দেওয়া হয়। চুল্লীর সর্বনিম্ন অংশে একটি প্রকোষ্ঠে এসে গলিত ধাতু এবং ধাতুমল জমা হয়। গলিত ধাতুমল ধাতুর উপরে ভাসে। এদের দুইটিকে আলাদা নল দিয়ে বের করে নেওয়া হয়। এই প্রকোষ্ঠের ঠিক উপরে কয়েকটি নলের সাহায্যে (tuyers) উচ্চচাপে উত্তপ্ত বায়ু চুল্লীর ভিতরে পরিচালিত করা হয়। তপ্ত বায়ুতে কোক জ্বলতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রায় কোক ও কোকের প্রজ্বলনে উদ্ভূত কার্বন-মনোক্সাইড ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে দেয়। উৎপন্ন তপ্ত গ্যাস উপরের একটি নির্গম পথে বেরিয়ে যায়। লৌহ-উৎপাদনে এরূপ বড় বড় মারুত চুল্লী সর্বত্র ব্যবহার করা হয়। তাম্র, সীসা প্রভৃতির নিষ্কাশনেও কিছু ছোট মাপের মারুত চুল্লী একটু পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। মারুত চুল্লীগুলি পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী। ইস্পাতের ভিতরের দিকে অগ্নিসহ মৃত্তিকার খুব পুরু আস্তর (lining)




চিত্র ৭। লোহা-উৎপাদনের মারুত চুল্লী

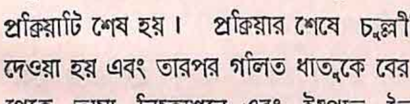
থাকে। জামসেদপুর, দুর্গাপুর, ভিলাই, সব লোহার কারখানাতেই এই চুল্লী দেখতে পাবেন।

২। **বিসমার চুল্লী** (Bessemer Converter) ঃ বিসমার চুল্লী পেটালোহার পাত দিয়ে তৈরী এবং ডিম্বাকৃতি, ভিতরের দিকে পুরু আস্তর থাকে ( চিত্র ৮ )। চুল্লীর মাঝখানে বা ভিতরের দিকে উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশের জন্য কতকগুলি নল থাকে। দুইটি শক্ত অক্ষদণ্ড এবং যন্ত্রযুক্ত চাকার সাহায্যে চুল্লীটি মাটি থেকে অনেক উপরে ঝুলান থাকে। চুল্লীটিকে কাত করে গলিত গাঢ় আকরিক বা অবিশুদ্ধ ধাতু ভরা হয়। তারপর সেটাকে উল্লম্ব অবস্থায় রেখে গলিত তরলে উত্তপ্ত বায়ু পরিচালনা করা হয়। এর ফলে আবর্জনা পুড়ে যায় এবং সেটা আস্তরের সাহায্যে ধাতুমলে পরিণত হয়ে গলিত ধাতুর উপরে ভাসতে থাকে। কয়েক মিনিটেই প্রক্রিয়াটি শেষ হয়। প্রক্রিয়ার শেষে চুল্লীটি কাত করে প্রথমে ধাতুমলকে ফেলে দেওয়া হয় এবং তারপর গলিত ধাতুকে বের করে নেওয়া হয় ; কপার সালফাইড থেকে তামা নিষ্কাশনে এবং ইস্পাত তৈরীতে এরকম কনভারটার বা চুল্লী ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৮। তামা-উৎপাদনে ব্যবহৃত বিসমার-চুল্লী

৩। **পরাবর্ত-চুল্লী** (Reverberatory Furnace) ঃ এই চুল্লীটি নীচু ছাদ-বিশিষ্ট একটি অগভীর আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মত ( চিত্র ৯ )। পাশে কয়লা পুড়িয়ে চুল্লীটিকে উত্তপ্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চুল্লীর ভিতরে উত্তপ্ত বায়ুও পরিচালিত করা হয়। চুল্লীর মেঝেতে আকরিক, কোক এবং বিগালকের মিশ্রণ রাখা হয়। উত্তপ্ত গ্যাসগুলি একটি চিমনী দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। বিগলনে এবং অনেক সময় তাপজারণেও এই রকম চুল্লী ব্যবহার করা হয়।


চিত্র ৯। পরাবর্ত চুল্লী

**থারমাইট পদ্ধতি ঃ** ধাতব অক্সাইডে ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত থাকে। এই অক্সাইড থেকে অক্সিজেনকে সরিয়ে নেওয়ার নাম বিজারণ। সচরাচর ধাতব অক্সাইডের এই বিজারণ উচ্চ উষ্ণতায় কোকের সাহায্যে করা হয় ; যেমন এর আগের অনুচ্ছেদে দেখেছি, আয়রন অক্সাইডকে কোক দিয়ে বিজারিত করে লোহা উৎপাদন করা হয়।

কিন্তু কোন কোন অক্সাইড, যেমন ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, ক্রোমিয়াম অক্সাইড ইত্যাদি, এগুলো উচ্চ উষ্ণতাতেও কোক দ্বারা বিজারিত হয় না। দেখা গেছে, উঁচু তাপমাত্রায় বিচূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিজেন আসক্তি খুব তীব্র। সেইজন্য ঐসব উত্তপ্ত অক্সাইডকে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বিজারণ করা হয়। ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশনের জন্য ঐসব ধাতুর অক্সাইডের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণ ধাতব অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ মিশিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শ্বেততপ্ত অবস্থায় অক্সাইড থেকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনকে টেনে নেয় এবং ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে আসে। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি তার অক্সাইডে পরিণত হয়। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে এরূপ বিজারণ করার পদ্ধতির নাম "গোল্ডস্মিড্ট থারমাইট পদ্ধতি"। রসায়নবিদেরা এই বিজারণকে সংকেত দিয়ে প্রকাশ করেন ঃ—

$$Cr_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Cr$$ ( ক্রোমিয়াম )

$$3MnO_2 + 4Al \rightarrow 2Al_2O_3 + 3Mn$$ ( ম্যাঙ্গানিজ )

অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

অনুরূপ একটি পদ্ধতিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ধাতব ক্লোরাইড থেকে সোডিয়াম ধাতুর সাহায্যে ক্লোরিন অপসারিত করে ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। অর্থাৎ সোডিয়াম দিয়ে ধাতব ক্লোরাইডকে বিজারিত করে ধাতুকে মুক্ত করা হয়।

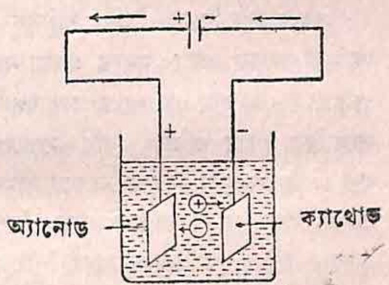
**ক্লোরাইডের বিজারণ ঃ** কোন কোন সময়ে যে ধাতুটি উৎপাদন করতে হবে আকরিক থেকে তার বিশুদ্ধ ক্লোরাইড প্রথমে প্রস্তুত করা হয়। তারপর সেই ধাতব ক্লোরাইডকে সোডিয়াম ধাতুসহ উচ্চ উষ্ণতায় গলান হয়। এর ফলে ক্লোরিন সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয় এবং প্রয়োজনীয় ধাতুটি মুক্তাবস্থায় পাওয়া যায়। থোরিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতু এভাবে তাদের ক্লোরাইড থেকে উৎপাদন করা হয়। বিক্রিয়ার শেষে উৎপন্ন পদার্থগুলিকে ফুটন্ত জলে দেওয়া হয়, লবণ (NaCl) দ্রবিত হয়ে যায় এবং ধাতুটি পৃথক হয়ে আসে।

$$ThCl_4 + 4Na \rightarrow 4NaCl + Th$$ ( থোরিয়াম )

থোরিয়াম ক্লোরাইড　সোডিয়াম　সোডিয়াম ক্লোরাইড

**তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ** তামা বা অন্যান্য সব ধাতু তড়িৎ-পরিবাহী অর্থাৎ তাদের ভিতর দিয়ে অনায়াসে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ধাতুটির কোন রূপান্তর ঘটে না। ধাতব লবণগুলিরও একটি বৈশিষ্ট্য হল যে তাদের গলিত অবস্থায় অথবা তাদের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। কিন্তু এই তড়িৎ-প্রবাহের সময় লবণটি বিভাজিত হয়ে যায়। যে সব পদার্থ এভাবে তড়িৎ সাহায্যে ভেঙে যায়, তাদের বলা হয় তড়িদ্-বিশ্লেষ্য পদার্থ। সব লবণই, যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কপার সালফেট, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি তড়িদ্-বিশ্লেষ্য।

তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণকে অথবা তাকে গলিত অবস্থায় একটি পাত্রে রেখে দুই প্রান্তে দুইটি ধাতুর পাত ( প্লাটিনাম বা নিকেল বা কপারের পাত ) তরলে আংশিক ডুবিয়ে রাখা হয়। পাত দু'টিকে একটি ব্যাটারীর পজিটিভ ও নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে জুড়ে দিলে দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হতে থাকে (চিত্র ১০)। এই দুইটি ধাতুর পাতকে বলা হয় তড়িৎ-দ্বার বা ইলেকট্রোড। যেটি পজিটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত তার নাম অ্যানোড (anode) আর যেটি নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত তার নাম ক্যাথোড (cathode)। অতএব বিদ্যুৎপ্রবাহ অ্যানোড দিয়ে তরলে প্রবেশ করে এবং ক্যাথোড দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। দেখা যায়, বিদ্যুৎপ্রবাহ চলার সময় লবণটি বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে এবং সর্বদাই লবণের বিশ্লেষণজাত ধাতুটি ক্যাথোডে এসে জমা হচ্ছে। ক্যাথোড থেকেই ধাতুটি সংগ্রহ করা হয়। এটাই ধাতু-উৎপাদনের তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি।




চিত্র ১০। তড়িৎ-বিশ্লেষণ

সিলভার নাইট্রেট, কপার সালফেট প্রভৃতি লবণের জলীয় দ্রবণ নিয়ে তার ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথোডে সিলভার, কপার প্রভৃতি জমতে থাকে। ঐ সকল ধাতু এভাবেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ সাহায্যে বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরী করা যেতে পারে।

কোন কোন ধাতু আছে যাদের অক্সাইডকে উচ্চ তাপমাত্রাতেও কোক অথবা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে বিজারিত করা যায় না ; যেমন, ক্যালসিয়াম অক্সাইড।

এসব ক্ষেত্রে প্রথমে অক্সাইডকে ধাতুটির ক্লোরাইডে পরিণত করে নিতে হয়। তারপর বিশুদ্ধ ক্লোরাইড লবণটিকে বিগলিত অবস্থায় রেখে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। তখন ধাতুটি ক্যাথোডে উৎসারিত হয়ে আসে।

| | | ক্যাথোডে | | অ্যানোডে |
|---|---|---|---|---|
| $CaCl_2$ | $\rightarrow$ | $Ca$ | $+$ | $Cl_2$ |
| $2NaCl$ | $\rightarrow$ | $2Na$ | $+$ | $Cl_2$ |
| | | ( ধাতু ) | | |

কখনও কখনও আকরিক থেকে পাওয়া অক্সাইডকে গলানো যায় না; যেমন, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। তখন সেই অক্সাইডকে অন্য কোন তড়িৎবাহী পদার্থে দ্রবিত করে নিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পরিচালনা করা হয়। ফলে, প্রয়োজনীয় ধাতুটি ক্যাথোডে উৎপন্ন হয়।

আজকের দিনের উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে সকল ধাতুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং যাদের আমরা নানা প্রয়োজনে নিয়োগ করি তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হবে এর পরের অধ্যায়গুলিতে। আগেই বলা হয়েছে দুই বা ততোধিক ধাতু গলিয়ে নিয়ে মিশালে সেগুলো সাধারণতঃ ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। ঠান্ডা হলে সেই কঠিনাকার সমসত্ত্ব মিশ্রণকে বলা হয় ঐ ধাতুদের সংকর। একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, বিশুদ্ধ একক ধাতু আমরা খুব কম ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি। অধিকাংশ স্থলেই বিভিন্ন ধাতু-সংকর ব্যবহৃত হয়। পিতলের কলসী, কাঁসার থালা, স্টেনলেসের বাসন, কোনটাই বিশুদ্ধ ধাতু নয়, সবই সংকর-ধাতু। মিশ্রণের ফলে সংকরের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমন্বয় হয় এবং সেইজন্য সংকর-ধাতু বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী হয়। বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম বা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে উড়োজাহাজের কাঠামো করা যায় না। কিন্তু এই দুইয়ের সংকর-ধাতু ডুরালুমিন ঐ কাজের পক্ষে খুবই উপযোগী।

## ৪

# দৈনন্দিন প্রয়োজনের ধাতু

## সোনা (Au)

ধাতুর মধ্যে সোনার সঙ্গেই মানুষের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল সেই উপলযুগেই। তার প্রধান কারণ পৃথিবীতে প্রায় সবটুকু সোনাই মৌলিক অবস্থায় বা ধাতুরূপে পাওয়া যায়। পাথর খুঁজতে গিয়ে মানুষ ছোট্ট ছোট্ট সোনার গুটি বা স্বর্ণ-খণ্ডের সন্ধান পেয়েছিল। স্বর্ণের অপরূপ বর্ণ, মনোরম উজ্জ্বলতা ও দ্যুতি, কোমল মসৃণতা আর তার নানা গুণের জন্য মানুষ আকৃষ্ট হয়েছিল। জলে, বাতাসে এর কোনই পরিবর্তন হয় না, আঘাতের ফলে পাথরের মত চূর্ণ হয়ে যায় না, গলানো হলেও ঠাণ্ডা করলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে—তাই এই দুর্লভ বস্তুটি সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের পরম প্রিয়। আজও পর্যন্ত মানুষের যা কিছু পরম আদরের, যা কিছু উত্তম, তাকে সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মা পরম স্নেহে শিশুকে বুকে চেপে বলে, 'সোনা, আমার সোনা।' লক্ষ্মী ছেলেকে বলে, 'সোনার টুকরো।' কোন জাতি বা সভ্যতার সবচেয়ে উন্নত কালটিকে বলা হয় 'স্বর্ণযুগ'।

আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগেও সোনার চলন ছিল। মেসোপটেমিয়াতে আর (Ur)-এর খনন থেকে সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের যে প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে তাতেও স্বর্ণালঙ্কার রয়েছে। ঋক্‌বেদেও হিরণ্যের উল্লেখ আছে, হিরণ্য সোনার এক নাম। সোনার এরকম অনেক নাম রয়েছে। স্বর্ণ, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম, কনক, কাঞ্চন, শাতকুম্ভ, তপনীয়, জাম্বুনদ, চামীকর, রুক্ম ; সোনার ল্যাটিন নাম Aurum, তাই এর রাসায়নিক চিহ্ন, Au।

প্রকৃতিতে সোনা মাটির নীচে কোয়ার্জ পাথরের বুকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানার আকারে থাকে। পাথরের সর্বত্র সোনা থাকে না। পাথরের মধ্যে লম্বা লম্বা শিরা সৃষ্টি করে সোনা বিধৃত হয়ে থাকে। এই স্বর্ণবাহী পাথুরে শিরাগুলিই সোনার উৎস। এই শিরার মধ্যে অনেক সময় সোনা এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে যে উপর থেকে দেখে সোনার অস্তিত্ব বোঝাই যায় না। বিস্তৃত

স্বর্ণশিরাকে বলে লোড (lode)। খনির ভেতর থেকে এই স্বর্ণধর কোয়ার্জ শিরা বা লোডকে যন্ত্রের সাহায্যে চূর্ণ করে প্রচুর বালুসহ উপরে তুলে আনা হয়। তারপর জলস্রোতের সঙ্গে এই বালু ও স্বর্ণকণার মিশ্রণকে পারদ-মাখানো তামার চাদর বা টেবিলের উপর দিয়ে পরিচালিত করা হয়। হালকা বালু জলের সঙ্গে বয়ে যায়। কিন্তু ভারী সোনার কণাগুলো পারদে আটকে যায় এবং সংকর সৃষ্টি করে। পরে পারদ স্তরটি চেঁচে নিয়ে পাতিত করলে, পারদ বাষ্পীভূত হয়ে আসে আর পাতন যন্ত্রে সোনা পড়ে থাকে।

যখন সোনার অনুপাত খুব কম থাকে তখন বালু-সোনার মিশ্রণটিকে একটি ট্যাঙ্কে লঘু সোডিয়াম সায়ানাইডের দ্রবণের সঙ্গে মিশান হয়। সোনা সায়ানাইডে দ্রবিত হয়ে যায়। বালু ছেঁকে আলাদা করার পর, দ্রবণে একটি জিঙ্ক দণ্ড রাখলে দ্রবণ থেকে সোনা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এই সোনা গলিয়ে নিয়ে বড় বড় টুকরা করা হয়।

সোনা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম কণাতেই থাকে, তবে কচিৎ কখনও বড় ডেলাও (nugget) হঠাৎ পাওয়া যেতে পারে। একবার অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় দু'শ পাউণ্ড ওজনের একটি বিরাট সোনার তাল পাওয়া গিয়েছিল, এর নাম "হলটারম্যান পিণ্ড।" বিহারে একসময় এক নদীতটের বালুকাতে ২৮·৬ গ্রাম ওজনের একটি সোনার ডেলা পাওয়া গিয়েছিল।

প্রকৃতিলব্ধ সোনার সঙ্গে প্রায়ই অন্যান্য ধাতু, বিশেষতঃ রূপা, অল্পাধিক মিশ্রিত থাকে। রূপা ছাড়াও, সময় সময় তামা, অ্যাণ্টিমনি, টেলুরিয়াম ধাতু সোনার সঙ্গে থাকে। এসব ক্ষেত্রে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোনাকে বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়।

প্রাচীনকালে অনেক নদীর তীরের বালু থেকে যথেষ্ট সোনা সংগ্রহ করা হত। এখনও কোন কোন নদীতটের বালু থেকে সামান্য সোনা পাওয়া যায়। এই সোনা বস্তুতঃ কোয়ার্জ-শিরা থেকেই আসে। রোদে, জলে, বাতাসে, বৃষ্টিতে বা অন্যান্য নৈসর্গিক কারণে কোয়ার্জ পাথর ভেঙে বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন স্রোতে সেই বালু-সোনার মিশ্রণ নদীপথে দূর দূরান্তরে চলে আসে এবং কালক্রমে বালুর সঙ্গে নদীতটে সোনার দানা থিতিয়ে পড়ে। ছোট ছোট ডালার মধ্যে বালু নিয়ে জলে মিশিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ধোয়া হয়; বালু জলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ভারী সোনার কণা ডালার নীচে সঞ্চিত হতে থাকে। অনেকবার এই প্রক্রিয়া করলে ডালাতে সোনাটুকু সংগৃহীত হয়। এখনও নদী-তটের বালু থেকে এইভাবে কিছু সোনা উদ্ধার করা হয়। আমাদের দেশে বিহারের সুবর্ণরেখা নদীতটের, নেফার সুবর্নসিরি, লোহিত প্রভৃতি নদীতীরের, উড়িষ্যার

হনুমনাতিয়া, বোড়াই, বনগির প্রভৃতি নদীতীরের বালু থেকে কিছু কিছু সোনা এইভাবে সংগ্রহ করা হয়।

সাগর জলেও সোনা আছে। সমুদ্রের সোনার মোট পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টন হলেও প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলে সোনা রয়েছে মাত্র ০˙০০০০০৬ ভাগ; এত স্বল্প গাঢ়ত্বে থাকার জন্য সাগরজল থেকে সোনা উদ্ধার করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর আর্থিক অবস্থা যখন খুবই সঙ্গীন, সেই সময় বিজ্ঞানী হেভার সাগরজল থেকে সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খরচ এত বেশী পড়ল যে সেই প্রচেষ্টা সফল হল না। ভূত্বকে সোনার পরিমাণ $৫ \times ১০^{-৭}$ %।

অধুনা প্লাটিনাম বা ইরিডিয়াম পরমাণুকে শক্তিশালী ডয়টেরন কণিকা দিয়ে আঘাত করে সোনার পরমাণুতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ অ্যালকেমি-বিদ্‌দের স্বপ্ন রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে। এই রূপান্তরের শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে, এর ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে পারে না কারণ প্লাটিনাম ও ইরিডিয়াম সোনার চেয়ে দামী।

অতি প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা মিটত পণ্যবিনিময়ের দ্বারা। কৃষক তার শস্য দিয়ে তার পরিবর্তে পশুপালকের কাছ থেকে ভেড়া সংগ্রহ করত। তাঁতী তার বস্ত্রের বিনিময়ে চাষীর কাছ থেকে নিত গম। কুমোর হাঁড়ি-কলসী দিয়ে সংগ্রহ করত তার রুটি। এইভাবে পরস্পরের অভাব পূরণ হত। এমন কি শ্রমের বিনিময়েও প্রয়োজনীয় খাদ্য পাওয়া যেত। সেদিনে রাজকোষ বা রাজ-ঐশ্বর্য বলতে বোঝাত গম, ভুট্টা, রুটি, মদ, বস্ত্র, অস্ত্র, চামড়া প্রভৃতির সুবিশাল ভাণ্ডার। সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী, শ্রমিক এদের জীবনধারনের প্রয়োজনীয় জিনিস সেখান থেকেই সরবরাহ হত। এ রকম বিনিময়-ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালু ছিল। এরপর যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পেল তখন উদ্বৃত্ত শস্য, বস্ত্র ইত্যাদির বিনিময়ের অসুবিধা দেখা দিল। চাষী যার কাছ থেকে বস্ত্র চায় সেই তাঁতীর হয়ত শস্যের তেমন প্রয়োজন নেই। আবার ধর, একটা দেশে প্রচুর শস্য রয়েছে। তাকে প্রয়োজনে অপর দেশ থেকে কাঁসা পিতল আমদানী করতে হবে। কিন্তু সেই দেশের শস্যের চাহিদা সীমিত—সুতরাং বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। মানুষ তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে কোন একটি মাধ্যমের ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা তথা অভাব পূরণ করা সহজতর হবে। কিন্তু মাধ্যমটিকে এমন হতে হবে যাতে সেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আকর্ষণীয় হয় এবং সেটা মহার্ঘ হওয়া প্রয়োজন। এই মাধ্যম অনুসন্ধানে শেষ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল

সোনার উপরে। সোনা অবিনশ্বর, সোনা দুর্লভ, সোনার প্রতি মানুষের লোভের অন্ত নেই। সুতরাং সোনা দিয়ে পণ্যের আদান প্রদান সহজতর হবে।

এর আগে সোনা ছিল সম্রাট, সামন্তরাজ, আর বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের কাছে। আর সোনা ছিল নানা মন্দিরে, দেউলে। সোনার অলংকারের আদরই ছিল প্রধান, আর সম্রাটেরা সোনা দিয়ে তাদের ঐশ্বর্য ও মর্যাদা দেখাতেন। সেই পুরাকালেও কিন্তু সোনার পরিমাণ কম ছিল না। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনে নেবুচাদ্‌নেজার যে বিরাট সাততলা ৬৫০ ফিট উঁচু দেব-দেউল জিগুরত (ziggurat) তৈরী করেছিলেন তার উপরের ছাদ ছিল সোনার আর তার উপর ছিল সোনার পালঙ্ক। এই সময়েই ব্যাবিলনে কিছু কিছু পণ্য সংগ্রহ হত সোনার বিনিময়ে। তখনও স্বর্ণমুদ্রা হয়নি। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড বা রৌপ্যখণ্ড ওজন করে করে তার বিনিময়ে শস্য, বস্ত্র পাওয়া যেত। আনুমানিক $\frac{1}{2}$ আউন্স পরিমাণ সোনার টুকরাকে বলা হত এক শেকেল (shekel) আর ৩৬০০ শেকেলে হত এক ট্যালেন্ট (talent)। সমসাময়িককালে মিশরেও প্রচুর সোনা ছিল। সম্রাট তৃতীয় থুতমোসের (খৃীষ্টপূর্ব ১৪৪৭) সময়ে কর হিসেবে রাজকোষে সোনারূপা জমা দিতে হত। তার রাজকোষে তখন ছিল নয় হাজার পাউণ্ড সোনা। সামন্তরা মিশরকে যে উপঢৌকন দিত তাতে হীরা, জহরৎ, অস্ত্রাদি ছাড়া, কখনও সোনা-রূপার তৈরী রথও থাকত। টুটেনখামেনের (খৃঃ পূঃ ১৩৬০) সমাধির প্রত্নসম্ভারে সোনা-রূপায় মোড়া চেয়ারও ছিল। এই থুতমোসের সময়েও ছোট ছোট সোনার গুটি ওজন করে বিভিন্ন পণ্য সংগ্রহ হত। তখনও নির্দিষ্ট মানের কোন মুদ্রার প্রচলন হয় নি।

দুর্ধর্ষ অ্যাসিরিয় সম্রাট সেনাচারিব-ই (খ্রীঃ পূঃ ৭০০) সর্বপ্রথম টাঁকশালে রূপা গলিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট ওজনের 'অর্ধ-শেকেল' সরকারী মুদ্রা চালু করেন। তারপরে লিডিয়ার রাজা ক্রোসাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৭০-৫৪৬) সোনা এবং রূপার ছাপ দেওয়া বা মোহরাঙ্কিত মুদ্রা তৈরী করে প্রচলন করেন। এই সব রাজকীয় মুদ্রার মান নির্দিষ্ট থাকাতে প্রতিক্ষেত্রে ওজন করে মূল্য নির্ধারণের আর প্রয়োজন রইল না। পণ্যের মূল্য মুদ্রায় স্থির করা হতে থাকল। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুবই সুবিধা হল। কিন্তু বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ্ উইল ডুরাণ্টের মতে হরাপ্পা সভ্যতার সময়েই (খ্রীঃ পূঃ ২৯০০) ভারতে মুদ্রার প্রচলন ছিল।

সরকারী মুদ্রা-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই রাজকোষে সোনা জমা হতে শুরু করল এবং সেই সংগৃহীত সোনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর। খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ শতক আগে সম্রাট দারিয়ুসের কালে (খ্রীঃ পূঃ ৫২১-৪৮৫) পারস্য সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার এক উত্তুঙ্গ শিখরে উঠেছিল[1]। সিন্ধুনদের তট থেকে পশ্চিমে আয়োনিয়া

এবং দক্ষিণে মিশর পর্যন্ত তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ২০টি সত্রপে বিভক্ত ছিল। ভারতকে তখন বার্ষিক নজরানা দিতে হত ৪৬৮০ ট্যালেণ্ট সোনা, যার মূল্য আজ এক হাজার কোটি টাকা। সমস্ত সত্রপের কাছ থেকে যে সোনা রাজকোষে আসত তার পরিমাণ ১৪৫৬০ ট্যালেণ্ট। ভারতকেই তার সিংহভাগ যোগাতে হত। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস দুজনেই বলেছেন, খনিজ পাথর থেকে সোনা উদ্ধারের পদ্ধতিটি ভারতীয়েরাই প্রথম আবিষ্কার করে। পারস্য সম্রাটের সিংহাসন ছিল সোনার, তার মাথার উপরের স্বর্ণখচিত চাঁদোয়া ছিল স্বর্ণদণ্ডের উপর। রাজসভাসদদের গৃহে খাবার টেবিল ছিল সোনার পাতে মোড়া ; পানপাত্র, চামচ ইত্যাদি থাকত সোনার। প্রচুর সোনা পারস্য সম্রাট যুদ্ধে ব্যয় করার পরেও আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য জয় করেন তখন রাজকোষ থেকে ১৮০০০০ ট্যালেণ্ট সোনা পেয়েছিলেন।

অতীত ভারতের স্বর্ণভাণ্ডারও ছিল বিপুল। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খ্রীঃ পূঃ ৩২২-২৯৮) পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় বলেছেন : "এমন ঐশ্বর্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বিশাল প্রাসাদের স্তম্ভগুলি সব সোনার চাদরে মোড়া। তার উপর সোনার লতাপাতা, পাখীর সব কারুকার্য।" কত পরিমাণ সোনা থাকলে এটা সম্ভব তা এখন কল্পনা করাও কঠিন। তাছাড়া, হিন্দুর দেবমন্দিরে চিরকাল থাকত অজস্র স্বর্ণালঙ্কার আর স্বর্ণমুদ্রা। তাই হাজার বছর পরেও মামুদ সেই সোনার লোভে বারংবার এসে সোমনাথের মন্দির লুট করেছিলেন। ইহুদী যুগের রাজা সলোমোনের স্বর্ণ ভান্ডারের খ্যাতি ছিল বিশ্ব জুড়ে। কথিত আছে প্রতি বছর আরবের খনি থেকে ৬৬০ ট্যালেণ্ট সোনা আসত রাজকোষে। জেরুজালেমে সলোমন যে যেহোভার মন্দির করেছিলেন তার কড়ি, বরগা ছিল সোনার ; দরজা, স্তম্ভ ইত্যাদি স্বর্ণাচ্ছাদিত। মন্দিরে ছিল সোনার ধূপদান, লণ্ঠন, শতাধিক সোনার পাত্র, চামচ ইত্যাদি।

এসব পুরাকালের কাহিনী। এ যুগেও কিন্তু স্বর্ণ আহরণ এবং সঞ্চয় সমান ভাবেই চলেছে। মানুষ যেখানেই সোনার সন্ধান পেয়েছে, সেখান থেকেই সম্পূর্ণ সোনাটুকু উদ্ধার করে এনেছে। তারপর আবার নতুন উৎসের সন্ধান করেছে। গত ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মোট উত্তোলিত সোনার ৬১% এবং ৮০% এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। আজ সে সব খনি নিঃশেষিত, সেখানে আর বিশেষ সোনা নেই। ভারতের কোলার স্বর্ণখনির ইতিহাসে একটু স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকেই ভারতের কোলার খনির প্রায় ১০০ ফিট গভীরতা এবং হুট্টি খনির ৬৫০ ফিট গভীরতা থেকে সোনা তোলা হত। আধুনিক যন্ত্রপাতি তো ছিল না, তবু এত গভীরে কী করে খননের কাজ হত সেটা

আশ্চর্যের বিষয়। কোন অজ্ঞাত কারণে—হয়ত জলস্রোতের জন্য কিংবা ধস নামার জন্য—আনুমানিক ১000 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ আমলে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেখানে আবার খনন শুরু হয়েছে এবং এখন প্রায় ৮000-৯000 ফিট নীচু থেকে সোনা তুলে আনা হচ্ছে।

সোনার প্রতি আসক্তি মানুষের মজ্জাগত। স্বর্ণলোলুপতা কত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, পাগলের মত ছুটিয়েছে। একসময় স্পেনীয়েরা মেক্সিকো থেকে প্রচুর সোনা আমদানি করত। তখন অনেক মানুষের মনে একটা ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর কোন এক সুদূর সীমান্তে এক সোনার দেশ—El Dorado—নিশ্চয়ই আছে, যার ধূলিমুঠিও সোনা। সেই দেশের সন্ধান সবাই করত। গত শতাব্দীতে বহু লোক গাঁইতি, শাবল, কোদাল, বন্দুক, ছোরা নিয়ে দূর দূরান্তরে যেত সোনার সন্ধানে। হঠাৎ কোথাও সোনা পাওয়া গেছে শুনলে হাজার হাজার লোক বনজঙ্গল ভেঙে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেও সেই দিকে ছুটত—এর নাম ছিল Gold Rush। সোনার লোভে মানুষ কি অসম্ভব কষ্ট সহ্য করত তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত এসব gold rush অভিযানের ইতিহাসে রয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত। ১৮৯৭ সনে আমেরিকার ইউকোনের স্কাগওয়েতে সোনা পাওয়া গেছে, খবর এল। দেখতে দেখতে ১0000 লোক সেদিকে ছুটল বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ২000 গিয়ে সেখানে পৌঁছাল, পথের কষ্টে অধিকাংশই মারা গেল আর কিছু যেতে না পেরে ফিরে এল।

আজকাল বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেনের মাপকাঠি সোনা। আমরা যখন যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ, যুদ্ধাস্ত্র, খাদ্য, এসব অন্য দেশ থেকে আমদানি করি তখন তার মূল্য সোনা দিয়ে পরিশোধ করতে হয়। সর্বত্রই এই রীতি। সুতরাং সব দেশেরই সোনার ভাণ্ডার রাখতে হয়। আজকাল সোনা সবচেয়ে বেশী সংগৃহীত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভ্যালের খনি থেকে। এর পরের স্থান হল যথাক্রমে রাশিয়া, কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬৭-তে কি পরিমাণ স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে উত্তোলিত হয়েছিল তার একটা তালিকা দেওয়া হল—এটা থেকে স্বর্ণ সংগ্রহের একটা ধারণা হবে।

১৯৬৭-তে স্বর্ণ উত্তোলন (কিলোগ্রাম)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| দক্ষিণ আফ্রিকা | — | ৯৪৯৫৭৭ | ঘানা | — | ২৩৭২৯ |
| রাশিয়া | — | ১৭৭২৭0 | অস্ট্রেলিয়া | — | ১৯৪৯৯ |
| কানাডা | — | ৮২১৯৮ | | | ...... |
| যুক্তরাষ্ট্র | — | ৪৯২৬২ | ভারত (১৯৭৭) | — | ৩0৯৫ |

ভারতে সোনা সামান্যই সংগৃহীত হয়। ভারতের সবগুলি স্বর্ণখনিই দক্ষিণাপথে। কর্ণাটকের কোলার এবং হুট্টি খনি থেকে বেশী সোনা পাওয়া যায় আর কর্ণাটকের গাদক খনিও উল্লেখযোগ্য। তামিলনাদের ওয়াইনাদ স্বর্ণ ক্ষেত্র এবং অন্ধ্রের অনন্তপুর খনি থেকেও কিছু সোনা উদ্ধার করা হচ্ছে। সব খনিগুলিই ভারত সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত।

এ যুগের সোনার শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী জমা রয়েছে বিভিন্ন দেশের সরকারী তোষাখানায় বা সরকারী ব্যাঙ্কে। এক সময়ে স্বর্ণমুদ্রা তৈরী হত। আজকাল স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন প্রায় নেই। অলঙ্কারের জন্যও যথেষ্ট সোনা খরচ হয়। তবে শক্ত করার জন্য অলঙ্কারের সোনায় কিছু রূপা বা তামা মিশিয়ে নেওয়া হয়। সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় "ক্যারেটে"। বিশুদ্ধ সোনাকে ২৪ ক্যারেট ধরা হয়। অলঙ্কারে সচরাচর ২২, ১৮, ১৪ বা ৯ ক্যারেট সোনা থাকে। অর্থাৎ, ১৮ ক্যারেটের সোনা হচ্ছে ৭৫% সোনা এবং ২৫% অন্য ধাতু।

বিভিন্ন সূক্ষ্ম শিল্পকর্মেও সোনার ব্যবহার আছে ; বুটি-জরির কাজে, সূক্ষ্ম লেসের কাজে। রূপা, তামা বা অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়ার জন্য বা গিলটি করার জন্য সোনা দরকার হয়। সোনার অতি পাতলা পাত তৈরী করা যায়। এমন কি মাত্র ১/১০০০০ মিমি পুরু সোনার পাতও করা যেতে পারে। সন্দেশ, চকোলেট, পান প্রভৃতিতে তবক হিসেবে পাতলা পাত ব্যবহার হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে কিছু সোনা প্রয়োজন হয়। দাঁতের গর্ত ভরাট করতে সোনা রূপার সংকর ব্যবহার হয়। ইদানীং সোনার আর একটি ব্যবহার শুরু হয়েছে। সোনার সূক্ষ্ম স্তর বা পাত সূর্যের তাপরশ্মিকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে। এইজন্য কৃত্রিম উপগ্রহগুলির বহিরাবরণে একটি সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্য সোনার স্তর জমিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে সূর্য রশ্মি উপগ্রহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেটাকে তাপিত করতে পারে না।

## রূপা

রূপা বা রজতও সোনার মত মহার্ঘ। পাথুরে যুগের আদিকালে যখন সোনার সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল প্রায় সেই সময়েই মানুষ রূপারও সন্ধান পেয়েছিল। রূপার তুষারধবল রূপ, শুভ্রাংশুর মত তার পেলব কোমল কান্তি ও দীপ্তি মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল সন্দেহ নাই। সোনার চেয়ে রূপার পরিমাণ অবশ্য বেশী ছিল। মিশর, আর, মহেঞ্জোদারো, তক্ষশিলা প্রভৃতির খনন

থেকে যে প্রত্নসম্ভার পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সোনার তুলনায় রুপোর অলংকার এবং বাসনপত্রই অধিক। প্রথম যে সীলমোহরাঙ্কিত মুদ্রা অ্যাসিরিয় সম্রাট সেনাচেরিবের আমলে প্রচলিত হয়েছিল সেটাও ছিল রুপার।

প্রকৃতিকে খানিকটা রুপো মৌলাবস্থায় অর্থাৎ ধাতুরূপেই পাওয়া যায়। পাথরের বুকে সোনার মতই লম্বা লম্বা শিরার মধ্যে রুপা জমে থাকে। পাথর চূর্ণ করে রুপা সংগ্রহ করা হয়। অনেক সময় প্রকৃতিজাত সোনার সঙ্গে ও কিছু রুপা মিশ্রিত থাকে। যেমন, কোলার ক্ষেত্র থেকে যে সোনা পাওয়া যায় তাতে কিছু রুপাও থাকে। সোনা শোধন করার পর রুপা পাওয়া যায়। এছাড়া রুপার কোন কোন যৌগ নানা খনিজ পাথরে থাকে। রুপার ল্যাটিন শব্দ Argentum, সেইজন্য একে 'Ag' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। রুপার প্রধান আকরিকগুলো হল: (১) আরজেনটাইট, $Ag_2S$, (সালফার যুক্ত), (২) প্রাউস্টাইট, $Ag_3AsS_3$, (আর্সেনিক ও সালফার যুক্ত); (৩) পাইরার জিরাইট, $Ag_2SbS_3$, (অ্যান্টিমনি ও সালফার যুক্ত); (৪) সোরার-জিরাইট, AgCl, (ক্লোরিন যুক্ত)। আমাদের দেশে এসব আকরিক নেই। দুই একটি দেশে এইসব আকরিকই রুপার উৎস। ভূত্বকে রুপা আছে $১ \times ১০^{-৫}$ %।

পৃথিবীতে যত রুপা সংগৃহীত হয় তার অধিকাংশই কিন্তু রুপার খনি থেকে বা আকরিক থেকে আসে না। বেশীর ভাগটাই আসে সীসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা (PbS) থেকে। গ্যালেনা খনিজ হচ্ছে সীসার সালফাইড, যার মধ্যে সর্বদাই কিছু রুপা থাকে। সালফার বিমুক্ত করে এই আকরিক থেকে সীসা ধাতুটি যখন উৎপাদন করা হয়, তখন সেই সীসার মধ্যেই রুপাটুকু থাকে। এই মিশ্রণকে বাতাসে তাপজারিত করলে, সীসা সম্পূর্ণতঃ তার অক্সাইডে পরিণত হয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। তখন অবিকৃত রুপা উদ্ধার করা হয়। সীসা থেকে এভাবে রুপা উদ্ধার করার পদ্ধতিটি ভারতে অনেক শতাব্দী পূর্বেই জানা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রুপা-উৎপাদন পদ্ধতি দেওয়া ছিল। রসরত্নসমুচ্চয়ে এবং নাগার্জুনের রসরত্নাকরে এই পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে। অনেকের মতে নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লোক; আবার অনেকে বলেন নাগার্জুন ছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে।

সবচেয়ে বেশী রুপার উৎপাদন হয় মেক্সিকো, কানাডা, পেরু, রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রায় সমান পরিমাণেই। একটি তালিকায় ১৯৬৭-খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশের রুপার উৎপাদন দেওয়া হল। ভারতে রুপার আকরিক নেই। কোলার, হুট্টি এবং অনন্তপুরের খনি থেকে যে সোনা তোলা হয় তার মধ্যে

একটু রূপা থাকে—প্রতি মেট্রিক টন আকরিকে মোটামুটি ০·৬ গ্রাম রূপা থাকে। বাকী সবটা রূপাই সীসার আকরিক থেকে সংগৃহীত হয়। প্রতি মেট্রিক টন গ্যালেনাতে গড়ে প্রায় ৭৭৫ গ্রাম রূপা পাওয়া যায়। ১৯৭৭-এ ভারতে ১৩২৩১ কিলোগ্রাম রূপা সংগ্রহ হয়েছে।

কয়েকটি দেশের রূপার উৎপাদন ( ১৯৬৭ )

| দেশ | রূপা ( কেজি ) | দেশ | রূপা ( কেজি ) |
|---|---|---|---|
| মেক্সিকো | ১১৭৯৯০২ | অস্ট্রেলিয়া | ৬১৪৬৯২ |
| কানাডা | ১১৩২৮৪৮ | জাপান | ৩৩৬৯৩৭ |
| পেরু | ১১১৫৫৫৭ | জার্মানী | ১৪৯২৮০ |
| রাশিয়া | ১০৮৮৫০০ | বলিভিয়া | ১৩২৯৫৩ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৯৯৮৯০০ | হণ্ডুরাস | ১২৪৬৮০ |

ভারত ( ১৯৭৭ )—১৩২৩১ ( কেজি )

সংগৃহীত রূপার অনেকটাই অবশ্য সরকারী তোষাখানায় থাকে। এক সময়ে অধিকাংশ দেশেই রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। আগে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের মুদ্রায় ৯০% রূপা এবং ১০% তামা থাকত। ১৯৬৫ তে রূপার অংশ কমিয়ে শতকরা ৪০ ভাগ করা হয়। ইংল্যাণ্ডের মুদ্রায় পূর্বে ছিল রূপা ৯২·৫%, তামা ৭·৫%। ১৯২০-তে রূপার ভাগ করা হয় ৫০ শতাংশ। আর ১৯৪৬ থেকে রূপার মুদ্রার পরিবর্তে তামা-নিকেলের ( ৩ : ১ ) মুদ্রা চালু হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় টাকায় থাকত রূপা, তামা, নিকেল আর দস্তা ; রূপো ৫০%। এখন অনেক দেশেই মুদ্রাতে রূপার ব্যবহার উঠে গেছে।

অলঙ্কার ও বাসনপত্র তৈরী করতে রূপা ব্যবহার হয়। মন্দিরের এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের থালা বাটি ইত্যাদি রূপা দিয়ে তৈরী হয়। ভারতবর্ষেই বোধ হয় রূপার অলংকার সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। জলবায়ু এবং সাধারণ ক্ষার বা অম্ল দ্বারা রূপা আক্রান্ত হয় না। এই কারণে, দুগ্ধ শিল্পে, কোহল এবং ভিনিগার প্রস্তুতিতে রৌপ্য-প্রলিপ্ত বড় বড় বাসন বা vats খুবই ব্যবহৃত হয়। বাতাসে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস থাকলে রূপা কিন্তু তার সংস্পর্শে কালো হয়ে যায়।

রূপার সর্বাধিক ব্যবহারিক প্রয়োগ ফটোগ্রাফীর শিল্পে। রূপা থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড সাহায্যে সিলভার নাইট্রেট তৈরী করা হয়। এই সিলভার নাইট্রেট থেকেই সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার ক্লোরাইড অতি সহজে প্রস্তুত হয়।

ফটোগ্রাফীর প্লেট ও ফিল্‌মের জন্য এই সিলভার ব্রোমাইড ও ক্লোরাইড একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য যথেষ্ট রূপা খরচ হয়।

ডাক্তারেরা সিলভার নাইট্রেটকে দাহক ( Caustic ) হিসাবে ব্যবহার করেন। ল্যাবরেটরীতেও সিলভার নাইট্রেট একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক বিকারক।

তামা, দস্তা ও রূপা ( ৬ ঃ ৩ ঃ ১ ) এই অনুপাতের মিশ্রণ বিশেষ ধরণের ঝালাইয়ের কাজে লাগে। এর গলনাঙ্ক ৭৩৫°C। সোনার উপর মণিমুক্তা বসানোর কাজে বা সোনার তারজালির কাজে সূক্ষ্ম ও মসৃণ ঝালাই প্রয়োজন, সেজন্য এই মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়।

## তামা

ধাতুর ব্যবহারিক প্রয়োগ সর্বপ্রথম তামা দিয়েই শুরু হয়েছিল। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে 'তাম্রযুগ' এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাম্রযুগের কথা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সেই প্রাচীনকালের সহজ সরল জীবনযাত্রাতে নানা দৈনন্দিন কাজে শুধু তামা ব্যবহৃত হত। আজকের এই উন্নত যান্ত্রিক সভ্যতার দিনে কিন্তু বহুরকমের প্রয়োজনে আরও অনেক অনেক বেশী পরিমাণ তামা ব্যবহার হচ্ছে। তামার গুরুত্ব ক্রমশঃই বাড়ছে।

তামার ইংরেজী নাম কপার, খ্রীষ্টজন্মেরও প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরের সাইপ্রাস দ্বীপে প্রচুর তামা ছিল আর সেই তামা বিভিন্ন দেশে চালান যেত। সাইপ্রাস থেকে পাওয়া এই ধাতুকে রোমানরা নাম দিয়েছিল সাইপ্রিয়াম ( Cyprium )। এই শব্দটি থেকেই তামার রাসায়নিক নাম হয় 'কিউপ্রাম' ( Cuprum ) এবং পরে তার অপভ্রংশে ইংরেজী নাম 'কপার' হয়েছে। চিহ্ন, Cu। ভূত্বকে তামা রয়েছে ০·০০৭%।

পুরাকালে পৃথিবীতে ধাতুরূপে তামা অনেকটা পাওয়া যেত; এখনও উরাল পর্বতের কাছে, সুইডেনে এবং আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের কাছে কিছু তামা মৌলাবস্থায় পাওয়া যায়। বর্তমানে তামার উৎস হচ্ছে কয়েকরকম খনিজ পাথর। এই খনিজগুলিতে তামা সচরাচর সালফাইড বা অক্সাইড যৌগরূপে থাকে। তামার প্রধান আকরিক হল চালকোপাইরাইটিস [ $CuFeS_2$ ], এতে তামা ও লোহার সালফাইড মিশ্রিত রয়েছে। অন্যান্য সালফারযুক্ত আকরিক হচ্ছে বোরনাইট [ $Cu_3FeS_3$ ], কোভেলাইট [CuS] এবং চালকোসাইট

[ $Cu_2S$ ]। অক্সাইড আকরিকসমূহের মধ্যে রয়েছে কিউপ্রাইট [ $Cu_2O$ ], ম্যালাকাইট [$CuCO_3$, $Cu(OH)_2$] এবং অ্যাজুরাইট [$2CuCO_3$, $Cu(OH)_2$]। কঙ্গোতে ম্যালাকাইটের সঙ্গে কিছু ক্রাইসোকোলা [$CuSiO_3$, $2H_2O$] আকরিক পাওয়া যায়। অনেক সময়েই খনিজগুলি উঁচু পাহাড়ের গা থেকে কেটে আনা হয়। আমেরিকাতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর বরাবর আলাস্কা থেকে চিলি পর্যন্ত প্রসারিত রকি এবং অ্যান্ডিস পাহাড়ের অনেক জায়গাতেই তামার আকরিক রয়েছে। আবার কখনও কখনও গভীর খাদ খনন করে মাটির নীচ থেকেও তামার খনিজ পাথর তুলে আনা হয়। যেমন আমাদের দেশে বিহারে মুসাবনী তাম্র খনিতে। এই সকল আকরিকে সচরাচর গড়ে ২-৩ শতাংশ তামা থাকে। বাকী সবটাই খনিজ-মল অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় মাটি, বালু, ডলোমাইট, কোয়ার্জ, প্রভৃতির আবর্জনা। এতটা মালিন্য থেকে মুক্ত করে তামা নিষ্কাশন করতে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি এবং যান্ত্রিক দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

বিচূর্ণ সালফাইড আকরিককে প্রথমে বারে বারে জল-তেলের মিশ্রণে ধুয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে অনেকটা কাদা-মাটি থিতিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং তেলের সঙ্গে সালফাইড আলাদা হয়ে আসে (পৃঃ ৩৪)। এই গাঢ়তর আকরিক-চূর্ণের সঙ্গে সিলিকা (বালু) মিশিয়ে মারুত-চুল্লীতে উত্তপ্ত বাতাসে তাপজারিত করা হয়। লোহা তখন আয়রন-সিলিকেট হিসাবে গলিত অবস্থায় অন্যান্য আবর্জনা নিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে এবং প্রায় শুদ্ধ কপার সালফাইড [ $Cu_2S$ ] পাওয়া যায়। এর নাম 'ম্যাট'। গলিত ম্যাটকে এর পরে বিসিমার চুল্লীতে ( চিত্র ৮ ) উপযুক্ত পরিমাণ বাতাসে উত্তপ্ত করলেই তামা নিষ্কাশিত হয়ে আসে। এই তামা প্রায় ৯৮% বিশুদ্ধ। আকরিকে যদি কিঞ্চিৎ সোনা রূপা থাকে তবে সেগুলোও এই তামাতেই চলে আসে। এই তামাকে তড়িৎশোধন করে বিশুদ্ধ তামা ( ৯৯·৯% ) তৈরী করা হয়। বাজারে প্রায় সর্বত্রই বিশুদ্ধ তামার চাহিদা। ভারতবর্ষেও এই পদ্ধতিতেই তামা উৎপাদন করা হয়।

তামার প্রয়োজন প্রতিদিনই বাড়ছে। ১৮০১-১৮১০ এই দশ বছরে পৃথিবীতে মোট তামার উৎপাদন ছিল ১৮২০০ টন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ সনের উৎপাদন ছিল ২০ লক্ষ টন ; ১৯৬০ সালে উৎপাদন বেড়ে হয় চল্লিশ লক্ষ টন। আর এই সাতের দশকে বাৎসরিক তামা উৎপাদনের গড় সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ টন, ( ৫৫৫০০০০) টন। লোহা ছাড়া অন্য কোন ধাতু তামার মত এত বেশী তৈরী হয় না। যদিও এখন অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন প্রায় তামার সমান। এই মোট উৎপাদনের প্রায় ৩/৪ অংশই পাঁচটি দেশে হয়,—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চিলি, জাম্বিয়া আর কানাডা। কয়েকটি দেশে তাম্র-উৎপাদনের পরিমাণ কিরকম তার একটি তালিকা দেওয়া হল।

বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত তামা ( ১৯৬৭ )

| দেশ | তামা ( টন ) | দেশ | তামা ( টন ) |
|---|---|---|---|
| আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র | ৯৫৪০০০ | কঙ্গো | ৩৫৩০০০ |
| রাশিয়া | ৮৮০০০০ | পেরু | ২০০০০০ |
| চিলি | ৭৩২০০০ | দঃ আফ্রিকা | ১৪১০০০ |
| জাম্বিয়া | ৭৩০০০০ | জাপান | ১৩০০০০ |
| কানাডা | ৬০৩০০০ | অস্ট্রেলিয়া | ৯৮০০০ |

আমাদের দেশে তামার আকরিক সামান্যই আছে। ভারতে দুইটি মাত্র তাম্রক্ষেত্র থেকে বর্তমানে এই ধাতুটি পাওয়া যাচ্ছে—একটি বিহারের সিংভূম জেলায় আর অপরটি রাজস্থানের ক্ষেত্রীতে। এই সব আকরিক সালফাইড জাতীয়। আকরিকের ওপরের অংশে কিছু কিছু সালফাইড আকরিক দীর্ঘদিন জলবায়ুর সংস্পর্শে অক্সিজেনযুক্ত সবুজ ম্যালাকাইটে পরিণত হয়ে থাকে। বিহারে মুসাবনী অঞ্চল থেকে আকরিক তুলে নিয়ে এসে ঘাটশীলায় মউভাণ্ডার ফ্যাক্টরীতে তামা নিষ্কাশন করা হয়। এখানকার আকরিকে তামার ভাগ ২.৩%। ১৯২৪ সালে এই কারখানার কাজ শুরু হয়। এখন ভারতে ( ১৯৮১-৮২ ) ২৪৭০০ টন তামা উৎপাদন করা হয়েছে। রাজস্থানে ক্ষেত্রীর আকরিকে তামার পরিমাণ শতকরা ১.০–১.৪ ভাগ। এখানে সম্প্রতি তামা-নিষ্কাশনের জন্য বিগলন-যন্ত্র বসেছে এবং কিছু কিছু উৎপাদন শুরু হয়েছে।

হাজারীবাগের বারগণ্ডায়, অন্ধ্রপ্রদেশের গুনটুর জেলার অগ্নিগুন্ডলায়, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার মালঞ্জখন্ডে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গা জেলার বেলিগুড্ডা পাহাড়ে, সিকিমের ভোটাংয়ে এবং আরও কয়েক জায়গায় তামার খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এসব আকরিক থেকে তামা উদ্ধার সম্ভব কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন চলছে। ভারতে এখন যে তামা উৎপাদিত হয় তাতে চাহিদা মেটে না। প্রচুর তামা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়।

তামা একটি উৎকৃষ্ট তড়িৎবাহী ধাতু। রূপা ছাড়া আর কোন ধাতু এত স্বচ্ছন্দে বিদ্যুৎ বহন করে না। মোটর, জেনারেটার, বৈদ্যুতিক রেল-ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ-বহনের তার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, সর্বরকম বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামে তামা অপরিহার্য। তামার প্রসার্যতা-গুণ সমধিক বলেই বেশ সূক্ষ্ম তার তৈরী

সম্ভব, সেইজন্যই নানা যন্ত্রপাতির কাজে তামা প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ-শিল্পেই সর্বাধিক তামা ব্যবহৃত হয়। তামার তাপ-বহন ক্ষমতাও যথেষ্ট ; তাই রান্নার বাসন-পত্র, রেডিয়েটর, হিমায়ক-যন্ত্র প্রভৃতিতে তামার প্রয়োজন হয়। অবশ্য অনেক সময়েই বিশুদ্ধ তামার পরিবর্তে তামার নানা ধাতু-সংকর ব্যবহার করা হয়।

স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং অন্যান্য প্রায় সব মুদ্রাতেই অল্পাধিক তামা মিশ্রিত থাকে। আমাদের দেশেই পাঁচ দশক আগে তামার পয়সা, আধ-পয়সা এবং পাই-পয়সা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যেও তাম্রমুদ্রা ছিল, তার তামার পরিমাণ ছিল ৯৬%।

তালা, দরজার ছিট্‌কিনি, নানারকম কলকব্জা, ছাপার ব্লক ইত্যাদিতে যথেষ্ট তামার ও পেতলের প্রয়োজন হয়। হিন্দুদের ঠাকুরঘরের নানা বাসনপত্র সাধারণতঃ তামা ও পিতলের। হিন্দুদের কাছে তামা ও তুলসী পবিত্র, তামা-তুলসী স্পর্শ করে তাঁরা শপথ নেন।

**তামার ধাতুসংকর ঃ** বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত করে তামার যত ধাতুসংকর তৈরী হয়েছে, লোহা ছাড়া আর কোন ধাতুর এত ধাতুসংকর নেই। টিন, দস্তা, নিকেল, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতু নানা অনুপাতে তামার সঙ্গে গলিত করে বহু সংকর তৈরী হয়েছে। নানা বিশিষ্ট গুণের জন্য এই সব ধাতু সংকরের ব্যাপক ব্যবহার হয়। এদের মধ্যে পেতল এবং ব্রোঞ্জ বা কাঁসার ব্যবহারই সর্বাধিক।

দস্তা মিশিয়ে তামা থেকে পেতল তৈরী হয়। সাধারণতঃ তামা ও দস্তার অনুপাত ৪ ঃ ১। পেতলের ব্যবহার তো সর্বজনীন। নানা দৈনন্দিন কাজের জিনিস, মূর্তি, চেন, ঘড়া, কলসী, থালা ইত্যাদি পেতল থেকে তৈরী হয়। সৈন্যদের ব্যাজ, বোতাম, বন্দুকের টোটা রাখার খোল ইত্যাদি পেতলের। কঠিন পেতলে থাকে, তামা ঃ দস্তা = ৩ ঃ ২। এদের বলা হয় Muntz ধাতু ; শক্ত ও উচ্চ উষ্ণতার কাজের যন্ত্র তৈরীতে এটা ব্যবহার করা হয়।

অতিরিক্ত পরিমাণ দস্তা ও একটু লোহা তামার সঙ্গে মিশিয়ে Delta metal প্রস্তুত করা হয়। এটা ঢালাই করার পক্ষে এবং পেটাইয়ের পক্ষে দুয়েরই উপযুক্ত। তাই বেয়ারিং, ভালভ্, জাহাজের প্রপেলার প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়।

তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে সাধারণ কাঁসা প্রস্তুত করা হয়। একসময় পৃথিবীতে কাংস্যযুগ ছিল। তখন যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক জিনিস কাঁসা দিয়ে তৈরী হত। সে ইতিহাস আগেই বলা হয়েছে। এখনও বিভিন্ন অনুপাতে টিন মিশিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী কাঁসা পাওয়া যায়। যেমন ; গান-মেটাল (Gun metal) ; এই ব্রোঞ্জে, তামা ঃ টিন = ৯ ঃ ১। পূর্বে এই ধাতু-সংকর

দিয়ে কামান তৈরী হত। বর্তমানে নানা ঢালাই করা কাঁসার জিনিস, বাসনপত্র তৈরী হয়। আর একটি সংকর বেল-মেটাল (Bell metal) এটা দিয়ে ঘণ্টা, মূর্তি, কাগজ-চাপা ইত্যাদি তৈরী হয়; এতে তামা : টিন = ৫ : ১।

কখনও কখনও ব্রোঞ্জের সঙ্গে সামান্য একটু ফসফরাস মিশিয়ে দেওয়া হয়, এর নাম ফস্‌ফর-ব্রোঞ্জ ; তামা : টিন : ফসফরাস = ৯৪ : ৫·৭ : ০·৩। ফসফর-ব্রোঞ্জ মরচে পড়ে নষ্ট হয় না এবং চুম্বকাকৃষ্ট হয় না। ঘড়ির স্প্রিং, এবং অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়। প্রায়ই ব্রোঞ্জের সঙ্গে একটু দস্তা মিশান থাকে—তামা : টিন : দস্তা=৮৮ : ১০ : ২। জলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পাম্প, স্টীম-উৎপাদক যন্ত্রে অনেক সময় এটি ব্যবহার করা হয়।

ব্রোঞ্জ কথাটি এখন একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়। টিন না থাকলেও ব্রোঞ্জ বলা হয়; যেমন সিলিকন-ব্রোঞ্জ, অ্যালুমিনিয়াম-ব্রোঞ্জ। সিলিকন-ব্রোঞ্জ টেলিগ্রাফের তারে ব্যবহৃত হয়। ৭ শতাংশ অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত তামার ব্রোঞ্জ সিগারেট কেস, গৃহসজ্জায় এবং সস্তা কৃত্রিম অলংকার প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয়।

'জার্মান সিলভার' তামার একটি সংকর, রূপার মত উজ্জ্বল, তাই এই নাম। প্লেট, কাপ এবং গৃহসজ্জার অনেক সামগ্রী জার্মান সিলভার দিয়ে তৈরী হয়। এতে আছে তামা, নিকেল ও দস্তা; মোটামুটি অনুপাত, তামা : নিকেল : দস্তা= ২ : ১ : ১।

তামার কয়েকটি যৌগেরও বহুল ব্যবহার আছে। তামার যৌগ পদার্থ জীবাণুনাশক বলে চাষের জমিতে পোকা-মাকড়ের ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করা হয়। কপার অ্যাসিটেট "ভার্ডিগ্রিস" নামে উজ্জ্বল রং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাণী দেহের কোষে এবং নানা উদ্ভিদে সামান্য তামার যৌগ থাকে, পুষ্টির জন্য এটা প্রয়োজন। শম্বুক জাতীয় এবং সন্ধিপদী প্রাণীদের শ্বাস-সহায়ক হেমোসায়ানিনে যে প্রোটিন রয়েছে তাতে আছে তামা, যেমন মানুষের রক্তের হেমোগ্লোবিনে রয়েছে লোহা। প্রবালদেহেও তামা রয়েছে। সামান্য একটু তামা পুষ্টির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। একটা পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কতকগুলো রক্তাল্প (anaemic) ইঁদুরকে দুধ এবং অন্যান্য লৌহযুক্ত খাদ্য দেওয়া হল। কিন্তু তাদের রক্তের কোনই উন্নতি হল না। কিন্তু পরে যখন সামান্য মাত্র কপার ঐ খাদ্যে মিশিয়ে দেওয়া হল, তখন ইঁদুরগুলো সুস্থ হয়ে উঠল। অর্থাৎ তামার অবর্তমানে শুধু মাত্র লৌহ দ্বারা পুষ্টি সম্ভব নয়।

## লোহা

লোহার ইংরেজী শব্দ আয়রন আর রসায়নবিদেরা নাম দিয়েছেন ফেরাম (Ferrum), চিহ্ন Fe। সংস্কৃত গ্রন্থে লোহার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায় ; যেমন, অয়স, কালায়স, অশ্মসার, কান্তলোহ। লোহার পুরানো দিনের কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। সেই যে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে লৌহযুগ শুরু হয়েছিল তার অপ্রতিহত গতি এখনও চলছে। বস্তুতঃ বর্তমান সভ্যতা প্রধানতঃই লৌহ-নির্ভর। এ যুগে প্লাস্টিক এবং অ্যালুমিনিয়াম থেকে অনেক বস্তুসম্ভারের সৃষ্টি সম্ভব হলেও লোহার প্রয়োজন রয়েই গেছে। লোহা কঠিন কঠোর, লোহা প্রচণ্ড চাপ গ্রহণে সক্ষম, লোহা থেকে তীক্ষ্ন ক্ষুরধার অস্ত্র তৈরী হয়। এমনি নানা গুণের জন্য লোহা তথা স্টীলের ব্যবহার প্রতিনিয়ত বেড়েই যাচ্ছে।

পৃথিবীতে মৌল অবস্থায় লোহা কদাচিৎ দেখা যায়। একমাত্র উল্কাপিণ্ডেই ধাতব লোহা পাওয়া যায়। লোহার প্রচুর যৌগ অবশ্য রয়েছে। দশ মাইল গভীর ভূ-পৃষ্ঠের স্তরকে ভূত্বক বলা হয়। এই স্তরের পদার্থের পরিমাণ মোটামুটি $১৭ \times ১০^{১৮}$ টন। ভূত্বকে লোহা রয়েছে শতকরা ৫ ভাগ। অর্থাৎ মোট লোহার পরিমাণ $৮{\cdot}৫ \times ১০^{১৭}$ টন। লোহা রয়েছে সর্বত্র মাটিতে, পাহাড়ে, নানারকম পাথরে নানা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে। পরিমাণে বিপুল হলেও সবকিছু থেকে তো লোহা নিষ্কাশন করা যায় না, খরচ পোষায় না। শুধুমাত্র কয়েকটি খনিজপাথর থেকেই সহজে লোহা উদ্ধার করা হয়। এই সব লৌহ-আকরিকের প্রায় সবগুলিই অক্সাইড অর্থাৎ অক্সিজেনযুক্ত। প্রধান আকরিকগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(১) হিমাটাইট ( $Fe_2O_3$ ), বাদামী লাল রংয়ের আকরিক। সাধারণতঃ এখানকার লোকে বলে লোহা-পাথর।

(২) ম্যাগনেটাইট ( $Fe_3O_4$ ), কালো এবং ভারী, চুম্বকে আকৃষ্ট হয়। এর সংস্কৃত নাম অয়স্কান্ত।

(৩) লিমোনাইট ( $2Fe_2O_3.3H_2O$ ), লালচে-হলুদ রংয়ের আকরিক।

(৪) সিডেরাইট ( $FeCO_3$ ), অপেক্ষাকৃত হাল্কা, ধূসর হলুদ রং।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ হিমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট থেকে লোহা উৎপাদন করা হয়। কিছু লিমোনাইট আকরিকও ব্যবহার হয়। আমাদের দেশের হিমাটাইট অতি উৎকৃষ্ট, এতে লোহা থাকে ৬২-৬৯%। বিশুদ্ধ $Fe_2O_3$-তে লোহার

পরিমাণ ৭০%। অর্থাৎ আমাদের আকরিকে যৎসামান্য আবর্জনা আছে। দাক্ষিণাত্যের ম্যাগনেটাইট আকরিকও বেশ উচ্চমানের।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অল্পাধিক লৌহ-আকরিক আছে। রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক পরিমাণ লোহার আকরিক উত্তোলন করা হয়। সব দেশে অবশ্য সব রকম আকরিক পাওয়া যায় না। রাশিয়া, সুইডেন, জার্মানী, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ম্যাগনেটাইট যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ম্যাগনেটাইট প্রায় নেই, সেখানে হিমাটাইট ও বিশেষতঃ লিমোনাইট আকরিক বেশী। ভারতে, সুইডেনে, জার্মানীতে, রাশিয়াতে, যুক্তরাষ্ট্রে, আরও অনেক দেশেই হিমাটাইট প্রচুর পাওয়া যায়। ফ্রান্স, কানাডা, স্পেনে লিমোনাইট একটি প্রধান লৌহ-আকরিক। বিভিন্ন দেশে কতটা লোহার আকরিক তোলা হয় নীচের তালিকা থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে ঃ

উত্তোলিত লৌহ আকরিক ( ১৯৬৭ )

| দেশ | পরিমাণ ( কোটি টন ) | দেশ | পরিমাণ ( কোটি টন ) |
|---|---|---|---|
| রাশিয়া | ১৮˙৫২ | সুইডেন | ৩˙১২ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৯˙৪৩ | চায়না | ৩˙০৯ |
| ফ্রান্স | ৫˙৪৩ | ভারত | ২˙৮৮ |
| কানাডা | ৪˙৬৬ | ব্রেজিল | ২˙৫৯ |

আরও দশ বছর পরে ১৯৭৭-এ ভারতে সংগৃহীত লোহার আকরিক বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪˙১৩ কোটি টন।

ভারতে সবচেয়ে বেশী লৌহ-খনিজ হচ্ছে হিমাটাইট। হিমাটাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বিহারের সিংভূম এবং উড়িষ্যার কেওনঝর, ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড় ও কটক জেলায়। এসব জায়গার প্রধান খনিগুলো হচ্ছে নোয়ামুণ্ডি, গরুমাহিষানি, বাদামপাহাড়, জোদা খনি, বারসুয়া, বোলানি, বড়াজামদা খনি। মধ্যপ্রদেশের দুর্গ জেলার বাইলাডিলা, দহেলি-রাজহরা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর হিমাটাইট রয়েছে। কখনও কখনও সম্পূর্ণ পাহাড়ই প্রায় হিমাটাইট পাথরে গঠিত। এখানকার হিমাটাইটে লোহার পরিমাণ ৬৫% এর উপরে।

এই সকল খনির আকরিক ব্যবহৃত হয় টাটার ( টিস্কো ), ভিলাইয়ের, রাউরকেল্লার ফ্যাক্টরীতে। দুর্গাপুর স্টীল কারখানার হিমাটাইট আসে বড়াজামদা খনি থেকে।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে গোগটে খনি এবং গোয়াতে বিছোলাম-পালে খনিতে বিপুল হিমাটাইটের ভাণ্ডার পাওয়া গেছে। বর্তমানে এখানকার উৎকৃষ্ট

হিমাটাইট বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। কর্ণাটকের হোসপেট, বেলারি এবং চিকমাগালুরে হিমাটাইট আছে যথেষ্ট। ভদ্রাবতীর কারখানায় অবশ্য দাক্ষিণাত্যের হিমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া, অন্ধ্রপ্রদেশে, রাজস্থানে এবং হরিয়ানাতেও কিছু ভাল হিমাটাইট আছে। ম্যাগনেটাইট সংগ্রহ হয় তামিলনাদের সালেম ও তিরুচিরাপল্লী, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কর্ণাটকের সিমোগা ও হাসান জেলা, বিহারের সিংভূম জেলা থেকে। এদেশে লোহার আকরিকের যে বিশাল ভাণ্ডার আছে তার সবখানি পরিমাপ করা হয়নি।

**ভারতের প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মোট লৌহ আকরিকের পরিমাণ**

| আকরিক | প্রমাণিত পরিমাণ [ কোটি টন ] | সম্ভাব্য ভাণ্ডার [ কোটি টন ] |
|---|---|---|
| হিমাটাইট | ৫৩২ | ১৭৫৩ |
| ম্যাগনেটাইট | ৬০ | ১৬১ |
| সিডেরাইট ও লিমোনাইট | ৫০ | ২০০ |

আমরা 'লোহা' কথাটিকে সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি। রেলিং, পেরেক, ছুরি-কাঁচি, ট্রাঙ্ক-বাক্স, কামান, বন্দুকের নল, ঘড়ির স্প্রিং ইত্যাদি—এদের সবই "লোহার তৈরী" বলি। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের জন্য বিভিন্ন গুণের লোহা প্রয়োজন হয়। যে লোহাতে রেলিং তৈরী হয় সেই লোহা দিয়ে ঘড়ির স্প্রিং তৈরী করা যায় না। রান্নার কড়াইয়ের লোহা আর রেল লাইনের লোহা এক নয়। গুণ হিসাবে লোহা তিন শ্রেণীর। একেবারে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ( ১০০% ) লোহা পাওয়া দুষ্কর ; শুধু ল্যাবরেটরীতে সামান্য পরিমাণে তৈরী হতে পারে। শিল্পজাত লোহাতে সর্বদাই কিছু কার্বন মিশ্রিত থাকে। লোহার গুণাগুণ এই মিশ্রিত কার্বনের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। তাই কার্বনের পরিমাণ অনুযায়ী লোহাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

| | | কার্বনের পরিমাণ |
|---|---|---|
| ১। | ঢালাই লোহা বা কাস্ট আয়রন (cast iron) ··· | ২~ ৪.৫% |
| ২। | ইস্পাত বা স্টীল (steel) | ··· ০.১৫~ ১.৫% |
| ৩। | পেটা-লোহা বা রট-আয়রন (wronght iron) ··· | ০.১০~০.২৫% |

অর্থাৎ কার্বনের পরিমাণ ঢালাই লোহাতে সব চেয়ে বেশী আর পেটা লোহাতে সব চেয়ে কম। কার্বন ছাড়াও সামান্য ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস ও সিলিকন প্রায়ই লোহাতে থাকে, বিশেষতঃ ঢালাই লোহাতে।

ঢালাই লোহা অপেক্ষাকৃত সহজে গলে, গলনাঙ্ক ১২০০°~১৩০০°C।

তাই সহজেই এই তরল লোহা দিয়ে ছাঁচে ঢালাইয়ের কাজ চলে। কিন্তু পিটিয়ে এই লোহার জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, শক্ত হলেও এই লোহা ভঙ্গুর এবং ঘাতসহতা কম। ঢালাই লোহাতে পান দেওয়া যায় না। এই লোহার স্থায়ী চুম্বকও হয় না। লোহার রেলিং এবং গৃহস্থালীর কিছু কিছু জিনিসপত্র তৈরী করতে এই লোহা ব্যবহার হয়। বস্তুতঃ ঢালাই লোহার প্রায় সবটাই ইস্পাত এবং পেটা-লোহাতে পরিণত করা হয়।

পেটা-লোহা ১৫০০°C-এরও বেশী তাপমাত্রায় গলে। এই লোহা অপেক্ষাকৃত নরম কিন্তু খুব ঘাতসহ, সেজন্য পিটিয়ে জোড়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই লোহাতেও পান দেওয়া যায় না কিম্বা স্থায়ী চুম্বকও করা যায় না। পেটা-লোহা থেকে সরু তার, চাদর, জাল, বৈদ্যুতিক চুম্বক, পিন, শিকল, পেরেক, জাহাজের খোল প্রভৃতি তৈরী করা হয়।

ইস্পাতে কার্বন থাকে ০·২৫—১·৫% ; গলনাঙ্ক ১৩০০°—১৪০০°C। অনেক সময়ে ইস্পাতের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন, প্রভৃতির একটি বা দুইটি ধাতু মিশিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ ইস্পাতের সংকর তৈরী করা হয়। ইস্পাত একটি অদ্ভুত ধাতু। খাদের তারতম্যে ইস্পাতের গুণের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। শক্ত, নরম, মরিচাহীন, স্বল্প-প্রসারণশীল, অত্যন্ত ঘাতসহ, নানা রকমের ইস্পাত তৈরী করা হয় সামান্য কিছু কিছু অন্য ধাতু মিশিয়ে। স্থায়ী চুম্বকের জন্য ইস্পাতই শ্রেষ্ঠ। ইস্পাতকে পান দেওয়া যায়। পিটিয়ে আবার স্টীলের পাত জোড়া দেওয়া যায়।

লোহিত-তপ্ত করে নিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলে দিলে ইস্পাত খুব শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর হয়। একে বলে কঠিন ইস্পাত বা hardened steel। এই কঠিন ইস্পাতকে নিয়ে আবার কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম করে যদি আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা হয় তবে এর ভঙ্গুরত্ব লোপ পায়, স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) বাড়ে এবং যথেষ্ট নমনীয় স্টীল পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলে 'ইস্পাতের পান (tempering) দেওয়া। ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ধীরে ধীরে শীতল করলে বিভিন্ন গুণের নমনীয় ইস্পাত পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন রকমের নমনীয়তা প্রয়োজন। যেমন, ছুরি তৈরীর স্টীল আর ইঞ্জিনের চাকার স্টীল এক নয়। তাদের ভিতর কার্বনের পরিমাণও বিভিন্ন অসংখ্য রকমে জিনিসে স্টীল বা ইস্পাত ব্যবহার করা হয় ; ঘড়ি, চুম্বক, ইঞ্জিন, মেসিনগান, কাঁটা-চামচ, কাস্তে, কুড়োল, ট্রাঙ্ক-বাক্স, রেল, পুল, কড়ি-বরগা যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদিতে প্রচুর ইস্পাত লাগে।

**লৌহ-নিষ্কাশন ঃ** আকরিক থেকে শুদ্ধ ঢালাই লোহাই নিষ্কাশন করা

হয়। ইস্পাত এবং পেটা-লোহা সরাসরি আকরিক থেকে উৎপাদন করা যায় না। এ দুটিকে ঢালাই লোহা থেকে তৈরী করা হয়। হিমাটাইট আকরিককে প্রথমে একটি পরাবর্ত চুল্লীতে নিয়ে বাতাসে উত্তপ্ত করা হয়। উদ্বায়ী পদার্থগুলি উড়ে যায় এবং আকরিকটি ছোট ছোট হালকা ও ঝাঁঝরা ডেলার আকারে পরিণত হয়। এর পর এই আকরিকের সঙ্গে বিজারক কোক এবং বিগালক চুনা-পাথর মিশিয়ে বিগলনের জন্য একটি মারুত-চুল্লীতে ( চিত্র ৭ ) দেওয়া হয়। চুল্লীর তলার দিক দিয়ে প্রচুর উত্তপ্ত বায়ু ভিতরে পরিচালিত হয়। উচ্চ উষ্ণতায় কোক এবং কার্বন মনোক্সাইড হিমাটাইটের আয়রন অক্সাইডকে বিজরিত করে লোহায় পরিণত করে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিগালক চুনাপাথর থেকে চুন তৈরী হয় এবং এই চুন বালু জাতীয় ( সিলিকা ) আবর্জনাগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গলিত ক্যালসিয়াম সিলিকেটের ধাতুমল তৈরি করে। এই ধাতুমল অন্যান্য সব মালিন্য যেমন ফসফরাস, 'সালফার যুক্ত যৌগগুলিকেও শোষণ করে নেয়। চুল্লীর নীচের অংশের উষ্ণতা সর্বাধিক, প্রায় ১৫০০°C। সেইজন্য লোহা এবং ধাতুমল উভয়েই গলিত অবস্থায় থাকে এবং চুল্লীর নীচের প্রকোষ্ঠে এসে জমা হয়। ধাতুমল হাল্‌কা, তাই তরল লোহার উপরে ভাসে। দুইটি বিভিন্ন নির্গম-দ্বার দিয়ে গলিত লোহা এবং গলিত ধাতুমল আলাদা বের করে সংগ্রহ করা হয়। এই লোহাতে ২-৪·৫% কার্বন তো থাকেই, তদুপরি কিছু ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন প্রভৃতিও থাকে। এটাই ঢালাই লোহা। ধাতুমল রাস্তা তৈরীতে বা সিমেণ্টের কারখানায় প্রয়োজন হয়। আজকাল একটি বড় কারখানায় ২৪ ঘণ্টায় ১৫০০টন লোহা উৎপাদন হয়। প্রতি ১০ টন লোহার জন্য ২০ টন আকরিক, ৮ টন কোক, ৫ টন চুনাপাথর এবং ৪০ টন উত্তপ্ত বাতাস প্রয়োজন হয়। ব্যয় কমাবার জন্য স্বভাবতঃই লোহার কারখানাগুলো আকরিকের উৎসের কাছাকাছি করা হয়। প্রচুর কোক প্রয়োজন, তাই কয়লাখনিও কাছে থাকা বাঞ্ছনীয়। কয়লা যেন সহজলভ্য হয় সেই ব্যবস্থাও করা দরকার। যে কোক ব্যবহার করা হয়, সেটা কয়লা থেকে তৈরী করে নেওয়ার জন্য আজকাল লোহার কারখানার সঙ্গেই কোক-আভন বসান হয়।

পেটা-লোহা ঢালাই লোহা থেকে তৈরী হয়। ভিতরের দেওয়ালে ফেরিক-অক্সাইডের আস্তর দেওয়া একটি পরাবর্ত চুল্লীতে ঢালাই লোহা নিয়ে গলান হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় দেওয়ালের ফেরিক-অক্সাইড অধিকাংশ কার্বনকে জারিত করে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত করে এবং সেটা চিমনী দিয়ে বেরিয়ে যায়। অন্যান্য পদার্থ যথা সালফার, সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতিও ফেরিক-অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গাদ হিসাবে গলিত লোহার উপরে ভেসে ওঠে এবং উপর

থেকে সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়। বিশুদ্ধতর লোহা পড়ে থাকে। চুল্লী থেকে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের এক একটি পিণ্ড বের করে এনে স্টীমচালিত যন্ত্রের সাহায্যে পেটানো হয় এবং তার উপরে চাপ দেওয়া হয়। চাপের ফলে ভিতরের গাদ বেরিয়ে যায় এবং পেটা-লোহার পিণ্ড পাওয়া যায়।

ঢালাই লোহা থেকে ইস্পাত তৈরী করার অনেক রকম পদ্ধতি আছে ঃ বিসিমার পদ্ধতি, ওপেন-হার্থ পদ্ধতি, সিমেণ্টেসন পদ্ধতি, তড়িৎ-তাপন পদ্ধতি ইত্যাদি। এদের মধ্যে বিসিমার পদ্ধতিতে খুব সহজে এবং স্বল্প সময়ে ইস্পাত পাওয়া যায়। সেইটিই এখানে উল্লেখ করা হবে। এই পদ্ধতিটি ১৮৫৬ সালে বিসিমার ইংল্যাণ্ডে স্বনামে প্রবর্তিত করেন। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু লিখেছেন, এই পদ্ধতিটি পূর্বেই আমাদের দেশে ছিল, "বিসিমার সাহেব মাদ্রাজ অঞ্চলের দেশী লৌহকারের কাছে শিখে" ওদেশে প্রবর্তন করেন। একটি ডিম্বাকৃতি বিসিমার চুল্লী বা কনভারটারে (চিত্র ১১) কয়েক টন গলিত ঢালাই লোহা নেওয়া হয়। তলা থেকে উচ্চ চাপে উত্তপ্ত বায়ু গলিত লোহার ভেতর দিয়ে




চিত্র ১১। বিসিমার কনভারটার

পরিচালনা করা হয়। কার্বন পুড়ে চলে যায়, অন্যান্য পদার্থ, যেমন ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস ইত্যাদি চুল্লীর আস্তরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গাদ হিসাবে পৃথক হয়ে যায়। এর পর উপর থেকে প্রয়োজন মত "স্পাইজেল" মিশান হয়। স্পাইজেল হচ্ছে অল্প লোহার সঙ্গে কার্বন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটি গলিত মিশ্রণ। যে রকম স্টীল চাই তদনুরূপ ধাতু নিয়ে লোহার সঙ্গে প্রয়োজনীয়

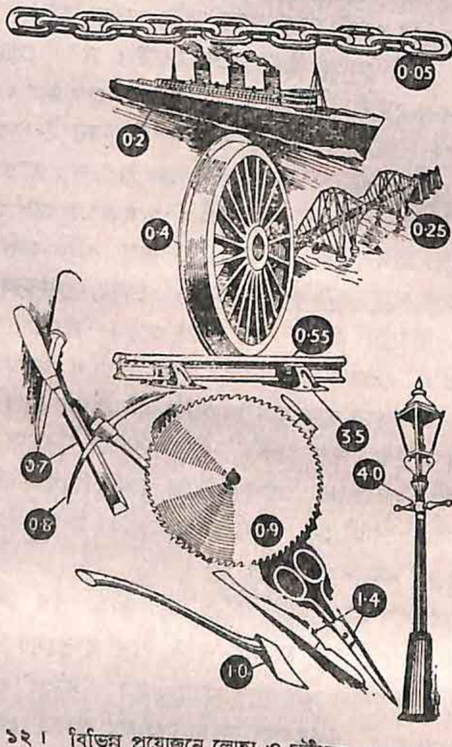
অনুপাতে মিশিয়ে নিয়ে গলিয়ে স্পাইজেল তৈরী করে রাখা হয়। যেমন, স্টেইনলেস স্টীলের জন্য স্পাইজেলে থাকে কার্বন, ক্রোমিয়াম ও নিকেল। বিসিমার চুল্লীতে আবর্জনাগুলো দূর হলে বিশুদ্ধ গলিত লোহা থাকে। তখন এই স্পাইজেল উপযুক্ত পরিমাণে চুল্লীতে দেওয়া হয়। তারপরেও প্রক্রিয়াটি কয়েক মিনিট চলে। প্রক্রিয়ার শেষে চুল্লীটি কাত করে স্টীল বের করে নেওয়া হয়। দশ মিনিটের মধ্যেই এভাবে ঢালাই লোহা থেকে স্টীল পাওয়া যায়।

**ব্যবহার ঃ** ঢালাই লোহার ব্যবহার বেশী নেই। ঢালাই লোহার অধিকাংশই ইস্পাতে পরিণত করা হয়। কিছুটা অবশ্য পেটা লোহাও করা হয়। ইস্পাতের ব্যবহার খুব ব্যাপক। সাধারণ ইস্পাত ছাড়াও নানা রকম ইস্পাতসংকর ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ধাতু নানা অনুপাতে মিশিয়ে শত শত রকমের ইস্পাতসংকর আজকাল তৈরী হচ্ছে। শক্ত এবং ক্ষয়রোধী ইস্পাত পেতে হলে প্রায় সব সময়েই ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে নেওয়া হয়। এই ম্যাঙ্গানিজ স্টীল অত্যন্ত কঠোর হয়। যে সব স্টীলের যন্ত্র খুব দ্রুত চালাতে হয়। যেমন, মেসিনগান, ধাতুকাটার করাত, সেগুলো ব্যবহার করার সময় তেতে ওঠে। সাধারণ স্টীল এই তাপে একটু নমনীয় হয়। সেজন্য এসব যন্ত্রের জন্য টাংস্টেন মিশ্রিত ইস্পাতসংকর প্রয়োজন। কখনও কখনও তার সঙ্গে ভ্যানেডিয়ামও দেওয়া হয়। এইসব সংকর উত্তপ্ত হলেও তার কাঠিন্য বজায় থাকে। ইস্পাতসংকরে নিকেল থাকলে ঘাত-সহতা বাড়ে এবং অ্যাসিডের আক্রমণ থেকে অনেকটা রক্ষা পায়। ক্রোমিয়াম মিশালে ইস্পাত মরিচা-রোধী হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনের লোহার জিনিসে কার্বনের অনুপাতও কম বেশী করতে হয় ( চিত্র ১০ )।

লোহার অনেক গুণ রয়েছে বটে, কিন্তু তার একটা বড় রকমের দুর্বলতা আছে। শুকনো বাতাসে কিছু হয় না, কিন্তু আদ্র বাতাসের সংস্পর্শে লোহার উপরে মরচে পড়ে এবং লোহা অতি দ্রুত ক্ষয়ে যায়। "মরিচা" লোহার ঝুরঝুরে বাদামী রংয়ের অক্সাইড। এভাবে যে লোহা নষ্ট হয় তাতে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। কলকব্জা, জিনিষপত্র অকেজো হয়ে যায়। মরচে যাতে না পড়ে সেজন্য লোহার জিনিষের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। জলের বালতি, ছাদের টিনে লোহার উপর দস্তার প্রলেপ থাকে। কেরোসিনের টিন, বিস্কুটের কৌটা ইত্যাদির উপরে টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। জানালার শিক, রেলিং ইত্যাদিকে রঙের আস্তর দিয়ে মরচে থেকে রক্ষা করা হয়। থালা বাটি কলাই করার কারণও তাই।

আজকাল অবশ্য ক্রোমিয়াম এবং নিকেল মিশ্রিত যে ইস্পাতসংকর—স্টেইনলেস স্টীল—তৈরী হয় তার বিস্তর চাহিদা। এই স্টীলে মরচে ত পড়েই না, তাছাড়া তা রুপার মত উজ্জ্বল এবং সুদৃশ্য। আবার সাধারণ অ্যাসিডেও আক্রান্ত হয়

না। ইস্পাতে বিভিন্ন অনুপাতে ক্রোমিয়াম ও নিকেল মিশিয়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী স্টেইনলেস স্টীল তৈরী করা হয় (ক্রোমিয়াম দ্রষ্টব্য)। দুগ্ধ-শিল্পে এবং কোন কোন রাসায়নিক শিল্পে এখন প্রায়ই স্টেইনলেস স্টীলের বড় বড় পাত্র, নল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বাসনপত্র, কাঁটা-চামচ ইত্যাদি আজকাল অধিকাংশই এই ইস্পাতের।




চিত্র ১২। বিভিন্ন প্রয়োজনে লোহা ও স্টীলের ব্যবহার। কার্বনের পরিমাণ নির্দেশ করা রয়েছে।

সোনা-রুপা ধনীদের ধাতু। তামা-কাঁসাও আজকাল বিশেষ প্রয়োজনে বিত্তবানদের সংসারেই দেখা যায় কিন্তু লোহা ধনী-দরিদ্র সবার একান্ত প্রয়োজন। লোহা সস্তা, সহজলভ্য, লোহা সর্বজনের—তাই লোহার আদর সর্বত্র। লোহার প্রশস্তি অনেকেই করেছেন। তবে কিপলিংয়ের চারটি পংক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"Gold is for the mistress, silver for the maid
Copper for the craftsman cunning at his trade."
"Good" said the Baron, sitting in his hall
"But Iron—Cold Iron—is the master of them all."

স্টীলের একটি প্রধান চাহিদা প্রতিরক্ষা বিভাগে। কামান, বন্দুক, রিভলবার, মেসিনগান, তীক্ষ্ণ-ক্ষুরধার অস্ত্র, সব কিছুর জন্যই উৎকৃষ্ট বিশেষ ধরণের স্টীল প্রয়োজন। ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজের মোটর ইত্যাদির জন্যও ভাল স্টীল খুব আবশ্যক।

সাধারণ প্রয়োজনের দা, কাস্তে, কুড়োল, ছাতের টিন, বালতি, শিকল, শিক, কব্জা, স্ক্রু, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষে স্টীল অপরিহার্য।

স্টীলের উৎপাদন সারা পৃথিবীতে কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে সেটা নীচের সারণী থেকে সহজেই বোঝা যাবে।

সারণী ঃ সারা পৃথিবীর স্টীল উৎপাদন

| বৎসর | ১৯০০ | ১৯২০ | ১৯৪০ | ১৯৬০ | ১৯৬৭ |
|---|---|---|---|---|---|
| উৎপাদন ( লক্ষ টন ) | ৩১০ | ৭৫৪ | ১৫৬০ | ৩৮১৫ | ৫৪৩০ |

২। কয়েকটি দেশের স্টীল উৎপাদন ( ১৯৬৭ )

| দেশ | উৎপাদন ( লক্ষ টন ) | দেশ | উৎপাদন ( লক্ষ টন ) |
|---|---|---|---|
| আঃ যুক্তরাষ্ট্র | ১২৭২ | চীন | ১২১ |
| রাশিয়া | ১১২৬ | পোলাণ্ড | ১১৫ |
| জাপান | ৬৮৫ | কানাডা | ১০৬ |
| পঃ জার্মানী | ৪০৫ | ভারত (১৯৬৭) | ৭০ |
| গ্রেট ব্রিটেন | ২৬৭ | ভারত (১৯৮২) | ১০৯ |

প্রচুর লৌহ আকর থাকা সত্ত্বেও পরাধীন ভারতে গত শতাব্দী পর্যন্ত লোহার বাণিজ্যিক উৎপাদন সম্ভব হয় নি। এই কয়েক দশক আগে পর্যন্তও আমাদের প্রয়োজনের লোহার জিনিস ইংল্যাণ্ড থেকেই আসত। কোথাও কোথাও স্থানীয় প্রয়োজনে কিছু কিছু লোহা উৎপাদন হত। আমাদের নিজেদের একটা লোহার কারখানা গড়ে তোলার কল্পনা জামসেদজী টাটার মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। বেরার ও মধ্য প্রদেশের নানা অঞ্চলে তিনি অনুসন্ধানও করেছিলেন, কিন্তু সব রকম উপাদানের ব্যবস্থা করা যায়নি ; বিশেষ করে কাছাকাছি কয়লার অভাবের জন্য। এরপর জামসেদজীর নির্দেশে ডোরাবজী টাটা দুর্গের ঢালি-রাজহারাতে খোঁজ করেন। সেখানে উৎকৃষ্ট আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেল এবং কোক ও চুনাপাথরেরও সন্ধান মিলল, কিন্তু জলের একান্ত অভাবের জন্য টাটারা সেখানে লৌহ-উৎপাদন সম্ভব বলে মনে করেননি। এর অর্ধশতাব্দী পরে অবশ্য সেখানে বিশাল "ভিলাই স্টীল কারখানা" হয়েছে।

এরকম সময়ে যখন টাটারা প্রকল্পটিকে বাস্তবে পরিণত করতে পারছিলেন না, সে যুগের বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু জামসেদজীকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি জানালেন, ময়ুরভঞ্জের ৩০০০ ফিট উঁচু গোরুমহিসানি পাহাড়ে আর তার আশেপাশে রয়েছে প্রচুর লোহার আকর, যার মধ্যে লোহার পরিমাণ অন্ততঃ ৬০%। তাছাড়া, কাছেই রয়েছে বাংলার কয়লার খনি; চুনাপাথরও সহজলভ্য। লোহার আকরিকের পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেল প্রায় ৩৫০ লক্ষ টন। প্রমথবাবু সে সময়ে ঐ অঞ্চলের নানারকম খনিজ সম্পদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। এই বাঙালী ভূতাত্ত্বিকের যেমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল তেমনই দূরদৃষ্টি ছিল। প্রধানতঃ এরই আগ্রহ এবং সক্রিয় প্ররোচনায় জামসেদজী এ বিষয়ে উৎসাহিত হন। কিন্তু এখানেও সেই সমস্যা ছিল, জলের অভাব। বড় কলকারখানার জন্য প্রচুর জল প্রয়োজন। আমেরিকার ভূতাত্ত্বিক ওয়েলড্ এবং তার সহকারী শ্রীনিবাস রাও গভীর জঙ্গলে অনুসন্ধান করতে করতে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেন—খারকাই এবং সুবর্ণরেখার সঙ্গমে একটা বড় প্রাকৃতিক জলাধার বা হ্রদ রয়েছে, যেখানে সারা বছর ধরেই যথেষ্ট জল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নানা রকমের বৈজ্ঞানিক হিসাব করে ওখানেই প্রথম ভারতীয় লৌহ শিল্প বসানো স্থির হল। জঙ্গল পরিষ্কার করা হল, রেল বসানো হল, ইঞ্জিনিয়ারদের শিখিয়ে আনা হল। অতি কষ্টে মূলধন সংগ্রহ হল—যাতে বিদেশীর কোন অধিকার না থাকে সেজন্য দেশের লোকের কাছেই ঋণপত্র ছাড়া হল। প্রথম দিকে অবশ্য খুবই অসুবিধে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী ( TISCO ) স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াল। এই হল প্রথম ভারতীয় লৌহ শিল্পের ইতিহাস।

স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের দেশে মোট লোহা আর স্টীলের উৎপাদন ছিল ১৩ লক্ষ টন। এর মধ্যে টাটাদের TISCO—থেকে উৎপাদন ১০ লক্ষ টন আর IISCO ( ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী ) থেকে ৩ লক্ষ টন। ১৯৫৪-এর পরে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে আরও কয়েকটি স্টীল ফ্যাক্টরি স্থাপন করা হয়েছে; যথা, ভিলাই, রউরকেল্লা, দুর্গাপুর ইত্যাদি। সমস্ত স্টীল ফ্যাক্টরিতে এখন মোট ৩০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমাদের দেশে স্টীলের উৎপাদন কি ভাবে বেড়েছে, তার হিসেব দিচ্ছি :—

| | ১৯৫০-৫১ | ১৯৬০-৬১ | ১৯৭০-৭১ | ১৯৮০-৮১ | ১৯৮১-৮২ |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টীল (লক্ষ টনে) | ১৫ | ৩৪ | ৬৬ | ৯৫ | ১০৯ |

১৯৭৪ সনে "স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড" স্থাপন করা হয়।

TISCO ব্যতিরেকে অন্য সব স্টীল ফ্যাক্টরিকে এর অধীনে আনা হয়। এদের উৎপাদনের পরিমাণ ঃ

লৌহ উৎপাদন ( লক্ষ টনে )

| | ১৯৭৫-৭৬ | ১৯৭৯-৮০ |
|---|---|---|
| ভিলাই | ২২ | ২১ |
| দুর্গাপুর | ১৩ | ৮ |
| রউরকেল্লা | ১০ | ১৩ |
| বোকারো | ৬ | ১৪ |
| ইস্কো (IISCO) | ৩ | ৬ |
| টিসকো (TISCO) | ১৮ | ১৮ |

ভারত এখন কিছু স্টীল রপ্তানীও করে। এই রপ্তানীর আর্থিক পরিমাণ ঃ—

| | ১৯৫০-৫১ | ১৯৭০-৭১ | ১৯৮০-৮১ |
|---|---|---|---|
| রপ্তানী মূল্য [ কোটি টাকা ] | ৩ | ২৯০ | ৮২ |

লোহা সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয় নি। সামান্য হলেও আমাদের দেহের জন্য লোহা একান্ত প্রয়োজন। এই লোহাটুকুর শতকরা ৫৫ ভাগ আছে লাল রক্তকণিকার হেমোগ্লোবিনে। বাকীটুকুর অধিকাংশ লিভারে এবং কোষের সাইটোক্রোমে। প্রতিদিন প্রায় ২০ লক্ষ লাল রক্ত কণা ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেটা নিয়ত পরিপূরণ করতে হয়। লোহা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। প্রতিদিন এইজন্য অন্ততঃ ২০—৩০ মিলিগ্রাম লোহা দেহের প্রয়োজন এবং সেটা খাদ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। সবুজ শাক-সবজী, ডাল, ফল এবং প্রানিজ লিভার থেকে এই লোহা দেহে প্রবেশ করে। ভুট্টা, মটরশাক, শালগম, ফুলকপি, শশা, নিমপাতা প্রভৃতিতে যথেষ্ট লোহা রয়েছে। এই লোহা দিয়ে হেমোগ্লোবিন তথা রক্তকণার সৃষ্টি না করলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। প্রাচীনকালে ভারতেই প্রথম রক্তশূন্যতা নিরাময়ের জন্য লোহা থেকে তৈরী "লৌহভস্ম" ব্যবহৃত হয়েছিল। এখনও ডাক্তারেরা রক্তহীনতায় সর্বদা লোহাঘটিত ওষুধ ব্যবহার করেন।

লোহার অপর কোন কোন যৌগেরও ব্যবহার আছে। যেমন, ফেরিক অক্সাইড রঙের কাজে ও পালিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। চিত্রাঙ্কনে প্রুশিয়ান ব্লু ( লৌহ-যৌগ ) নীল রঙ হিসাবে যথেষ্ট আদৃত। লেখার কালি তৈরী করতে ফেরাস সালফেট প্রয়োজন হয়।

## অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটির প্রাচীন ঐতিহ্য কিছু নেই, এর সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছে এই আধুনিক যুগে। ফটকিরি বা অ্যালাম অনেক কাল থেকেই ব্যবহার হয়ে আসছে। সেই অ্যালামের মধ্যে এই ধাতুটি রয়েছে তাই নাম অ্যালুমিনিয়াম; চিহ্ন Al। সমস্ত ধাতুর মধ্যে ভূত্বকে অ্যালুমিনিয়ামই রয়েছে সর্বাধিক পরিমাণে—প্রায় ৮·০৭ শতাংশ। ধাতু হিসাবে প্রকৃতিতে অ্যালুমিনিয়াম নেই। অ্যালুমিনিয়ামের বেশীর ভাগটাই রয়েছে নানারকম মাটি আর শিলাতে সিলিকেট রূপে—যেখান থেকে অ্যালুমিনিয়াম উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। যে খনিজ আকরিক থেকে এই ধাতুটি সর্বদা নিষ্কাশিত করা হয় সেটি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড, নাম 'বক্সাইট' ($Al_2O_3$, $2H_2O$)। অবশ্য এর সঙ্গে আরও দুইটি অক্সাইড আকরিক 'গিবসাইট' ($Al_2O_3,3H_2O$) এবং 'ডায়াস্পোর' ($Al_2O_3$, $H_2O$) প্রায়ই মিশ্রিত থাকে। বক্সাইট আকরিক অবশ্য বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ($Al_2O_8$) নয়—এর মধ্যে মালিন্য হিসাবে আয়রন অক্সাইড এবং সিলিকা (বালু) সর্বদাই খানিকটা থাকে। যে সব খনিজ আকরিকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ ৪০ শতাংশের বেশী, সেই আকরিকগুলিই ধাতু উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাটির উপরেই সমতলভূমিতে অথবা ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে বক্সাইট স্তূপীকৃত হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম-সমৃদ্ধ শিলা থেকেই আবহাওয়ার সংস্পর্শে ক্ষয়িত হয়ে এই বক্সাইটের উৎপত্তি। অনেক দেশেই অল্পাধিক বক্সাইট রয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জ্যামাইকা দ্বীপে প্রচুর বক্সাইট রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও খুব ভাল জাতের যথেষ্ট বক্সাইট আছে; তা ছাড়া ফ্রান্স, রাশিয়া, গিনি, হাঙ্গেরী, সুরিনাম, যুগোশ্লাভিয়াতে বেশ বেশী পরিমাণে এই আকরিক রয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বক্সাইটের পরিমাণ সীমিত এবং কানাডাতে বক্সাইট নেই।

ভারতের বক্সাইট-ভাণ্ডারও কম নয়। অনুমান করা হয়েছে, আমাদের প্রায় ১৩৫ কোটি টন বক্সাইট আকরিক মজুত আছে। এর অধিকাংশটাই রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালায় এবং তার কাছাকাছি। অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশেই বেশী বক্সাইট আছে। গুজরাট, কর্ণাটক, জম্বু-কাশ্মীর প্রদেশেও বেশ খানিকটা বক্সাইট আছে। ভারতের বক্সাইটে প্রায়ই ৫০ শতাংশেরও বেশী অ্যালুমিনা থাকে। ১৯৭৭ সালে ভারতে মোট বক্সাইট উত্তোলিত হয়েছে ১৪,৭১,১০৮ টন। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন দেশে খনি থেকে কত পরিমাণ বক্সাইট সংগ্রহ হয়েছে সেটা দেওয়া হল।

বিভিন্ন দেশে উত্তোলিত বক্সাইটের পরিমাণ (১৯৬৭)

| দেশ | বক্সাইট ( লক্ষ টন ) | দেশ | বক্সাইট ( লক্ষ টন ) |
|---|---|---|---|
| জ্যামাইকা | ১০২ | ফ্রান্স | ৩১ |
| সুরিনাম | ৫৮ | যুগোশ্লাভিয়া | ২৪ |
| রাশিয়া | ৫৬ | আঃ যুক্তরাষ্ট্র | ১৯ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৪৭ | গিনি | ১৮ |
| গায়েনা | ৩৭ | হাঙ্গেরী | ১৮ |

অ্যালুমিনিয়ামের আবিষ্কারের কাহিনীটি একটু বিচিত্র। মৃত্তিকা থেকে ডেভি (১৮০৭) একটি অক্সাইড জাতীয় পদার্থ পৃথক করেন। তিনি বলেছিলেন যে এর মধ্যে একটি অজ্ঞাত ধাতু রয়েছে কিন্তু ধাতুটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন নি। কিন্তু এই অজ্ঞাত ধাতুটির তিনি নামকরণ করে দিয়েছিলেন,—"অ্যালুমিনিয়াম"। এরপর ১৮২৫ সালে অনেক প্রচেষ্টার পর ডেনিশ বিজ্ঞানী অরস্টেড অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড থেকে সর্বপ্রথম সামান্য একটুখানি অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করতে সমর্থ হন। তার দু'বছর পরে জার্মান রসায়নবিদ্ উলার (Wöhler) একই উপায়ে স্বল্প পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম পাউডার তৈরী করেন। ১৮৫৫ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী ডেভিল কয়েক সেন্টিমিটার লম্বা সরু একটি অ্যালুমিনিয়াম দণ্ড তৈরী করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এরকম হাল্কা ধাতু এর আগে কেউ দেখেনি। দুষ্প্রাপ্য সুতরাং দুর্মূল্য এই ধাতুর স্থান তখন সোনারও উপরে ছিল। সে সময় প্রতি আউন্স অ্যালুমিনিয়ামের দাম ছিল সাত পাউন্ড ( £7 )।

অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে প্রথম যে জিনিষটি তৈরি হয়েছিল সেটি হল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শিশুপুত্রের জন্য একটি ঝুমঝুমি। এই সম্রাট তাঁর নিজের জন্য এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কয়েক সেট আলুমিনিয়ামের কাঁটা-চামচ তৈরী করিয়েছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের এবং অভিজাতদের জন্য ছিল সোনার কাঁটা-চামচ। ১৮৮৪ সালে ওয়াশিংটনের মনুমেন্টের মাথার চূড়ার আবরণে প্রায় ছয় পাউন্ড ওজনের অ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহৃত হয়েছিল। সেদিনে এতখানি আলুমিনিয়াম ধাতু কোন ব্যাপারে ব্যয় করা যেতে পারে সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য ছিল।

গত শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত যেটুকু অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হত সেটা অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড থেকে। বর্তমানে কিন্তু বক্সাইটের অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড থেকে এই ধাতুটি তৈরী হচ্ছে। বিচূর্ণ বক্সাইটকে উত্তপ্ত গাঢ় কস্টিক সোডার দ্রবণে জীর্ণ করা হয়। একটি বিশেষ রাসায়নিক উপায়ে ঐ দ্রবণ থেকে মালিন্য দূর করে প্রায় বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। অ্যালু-

মিনিয়াম অক্সাইডের প্রচলিত নাম অ্যালুমিনা। বর্তমানে এই অ্যালুমিনাই ধাতুটির উৎপাদনের উৎস।

সচরাচর ধাতব অক্সাইডকে উত্তপ্ত অবস্থায় কোক দিয়ে বিজারিত করলে অক্সিজেন চলে যায় এবং ধাতুটি পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই উপায়েই লোহা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি ধাতু যার যার অক্সাইড থেকে প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু অ্যালুমিনা ($Al_2O_3$) অতি উত্তপ্ত অবস্থায়ও কোক দ্বারা আদৌ বিজারিত হয় না। সুতরাং এই পদ্ধতিটি অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে অচল।

কোন কোন ধাতব অক্সাইডকে উচ্চ উষ্ণতায় গলিয়ে নিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে ধাতুটি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অ্যালুমিনা উচ্চ তাপমাত্রায় গলে না বরং ভাস্বর হয়ে ওঠে। অতএব সেই পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যায় না।

এই দুইটি অসুবিধার জন্য বহুদিন পর্যন্ত মানুষ অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটিকে বেশী করে উৎপাদন করতে পারেনি। ১৮৮৬ সালে এই সমস্যার সমাধান করেন পৃথক পৃথক ভাবে দুই তরুণ বিজ্ঞানী। আগে এঁদের একে অপরের পরিচয়ও জানতেন না। একজন ফরাসী, নাম পল হেরো (Paul Heroult) আর অপরজন আমেরিকান, নাম চার্লস মার্টিন হল। গ্রীনল্যাণ্ডে ক্রায়োলাইট ($Na_3AlF_6$) নামক একটি খনিজ পাওয়া যায়। অ্যালুমিনা গলে না বটে, কিন্তু উচ্চ উষ্ণতায় গলিত ক্রায়োলাইটে অ্যালুমিনা বেশ দ্রবিত হয়। এই গলিত দ্রবণের ভিতরে বিদ্যুৎ পরিচালনা করলে তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে এসে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উৎসারিত হয়। এই পদ্ধতিটি সহজতর এবং ব্যয়বহুল নয়। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টন অ্যালুমিনিয়াম এ ভাবেই তৈরী হচ্ছে। এক টন অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করতে চার টন বক্সাইট লাগে আর তার সঙ্গে ১৫০ পাউণ্ড ক্রায়োলাইট ব্যয় হয়। প্রতি টন ধাতুর জন্য ২২০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ২০০০ পাউণ্ড কার্বন, ৮০০ পাউণ্ড সোডা, ৬০০ পাউণ্ড চুনাপাথর এবং আড়াই টন কোক (তাপ-উৎপাদনে) খরচ হয়।

বিভিন্ন দেশে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের একটি সারনী দেওয়া হল।

অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন (১৯৬৭)

| দেশ | অ্যালুমিনিয়াম (লক্ষ টন) | দেশ | অ্যালুমিনিয়াম (লক্ষ টন) |
|---|---|---|---|
| আঃ যুক্তরাষ্ট্র | ৩২.৭ | ফ্রান্স | ৩.৯৮ |
| রাশিয়া | ১০.৬ | জার্মানী | ২.৮ |
| কানাডা | ৯.৬ | ইটালী | ১.৪০ |
| জাপান | .২ | ভারত (১৯৬৭) | ১.০৬ |
| নরওয়ে | ৪.০ | ভারত (১৯৮১-৮২) | ২.০৬ |

অ্যালুমিনিয়াম বহু রকমের প্রয়োজনে ব্যবহার হয়ে থাকে। এর কারণ অ্যালুমিনিয়ামে এমন নানা গুণের সমাবেশ, যেটা অন্য কোন ধাতুতে দেখা যায় না। অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হাল্‌কা ; অ্যালুমিনিয়ামের ওজন সমায়তন স্টীলের ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র। অ্যালুমিনিয়াম বেশ ভাল তাপ এবং তড়িৎ পরিবাহী। অ্যালুমিনিয়ামের খুব সরু তার এবং পাতলা পাত তৈরী করা যায়। এক কিলোগ্রাম অ্যালুমিনিয়াম থেকে ২৫০০০ মিটার সরু তার করা সম্ভব। আবার গোলাকার বা চৌকো শিকও তৈরী হয়। অ্যালুমিনিয়াম নমনীয়, ঘাতসহ, উত্তাপে পিটিয়ে নানা আকার বা জোড়া দেওয়া যায়। ঢালাই করা যায়। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম নরম হলেও এর অনেক সংকর অত্যন্ত শক্ত। অ্যালুমিনিয়াম জলবায়ুতে আক্রান্ত হয়ে লোহার মত মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায় না।

সাধারণতঃ অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে সামান্য কিছু তামা (Cu) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মিশিয়ে সংকর প্রস্তুত করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের এই সকল সংকর বেশ শক্ত এবং এদের কাঠিন্য মিশ্রণের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। এসব সংকর প্রভূত চাপ সহ্য করতে পারে, এমন কি প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৯০০০০ পাউন্ড চাপ গ্রহণ করতে সক্ষম। সংকর ধাতুগুলির মধ্যে 'ডুরালুমিন' প্রধান। এটি উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছে। কয়েকটি অ্যালুমিনিয়াম-সংকরের নাম উল্লেখ করা হল ঃ—

অ্যালুমিনিয়াম-সংকর

| সংকর ধাতু | উপাদান অনুপাত | ব্যবহার |
|---|---|---|
| ১। ম্যাগনেলিয়াম | Al : Mg = ৯৮ : ২ | তুলাযন্ত্র, হাল্কা যন্ত্রপাতি |
| ২। ডুরালুমিন | Al : Cu : Mg : Mn = ৯৫ : ৪ : ০'৫ : ০'৫ | উড়োজাহাজ, রেলের কামরা ইত্যাদি |
| ৩। Y-সংকর | Al : Cu : Mg : Ni = ৯২'৫ : ৪ : ১'৫ : ২ | মরিচারোধী, জারনরোধী সামগ্রী |
| ৪। অ্যালনিকো | ইস্পাত : Al : Ni : Co = ৫ : ২ : ২ : ১ | স্থায়ী চুম্বকের জন্য |

এছাড়াও আরও অ্যালুমিনিয়ামের সংকর রয়েছে। অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জের বিষয় তামার কথাতেই বলা হয়েছে। উত্তম ঢালাইয়ের জন্য সিলিকনযুক্ত সংকর উৎকৃষ্ট।

অ্যালুমিনিয়াম খুবই হাল্কা ; ডুরালুমিন সংকর তার চেয়ে সামান্য একটু ভারী। উড়োজাহাজ এবং তার ফ্রেম, পাখা ইত্যাদি আজকাল ডুরালুমিন দিয়ে তৈরী হচ্ছে। এমন কি উড়োজাহাজের বিখ্যাত রোলস্ রয়েস ইঞ্জিনেরও প্রায় ৪৬ শতাংশ অ্যালুমিনিয়ামের। স্টীলের বদলে এই সংকর ব্যবহার করাতে ওজন অনেক কমে গেছে। এর ফলে প্লেনের গতিবেগ বেড়েছে এবং পরিবহন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অনেক দেশেই বর্তমানে রেলগাড়ীর কামরা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী হয়, যদিও স্টীলের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের দাম দশ শতাংশ বেশী। কিন্তু হাল্কা হওয়াতে ইঞ্জিন অনেক বেশী কামরা টেনে নিতে পারে। সেজন্য যথেষ্ট ব্যয় সংকোচ হয়। বড় বড় জাহাজের, যেমন ব্রিটিশ জাহাজ ক্যানবেরার উপরের কাঠামোর প্রায় ১১০০ টন অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী। ফলে, জাহাজটি অনেক বেশী যাত্রী বহন করতে পারে এবং গতির হারও বেশী। বাস, ট্যাক্সি, লঞ্চ, নৌকো ইত্যাদিও অ্যালুমিনিয়াম সংকর দিয়ে তৈরী হচ্ছে। ডুরালুমিনের চাদরের দু' পিঠেই অতি পাতলা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের আস্তরন দিয়ে নেওয়া হয়। একে বলে "Alclad" এটা সম্পূর্ণ মরিচারোধী। সুতরাং জলবায়ুতে, এমন কি লোনা জলেও তা ব্যবহার করা যায় ; কোন ক্ষয় হয় না। শক্ত বলে এবং ক্ষয়িত হয় না দেখে এই সংকর দিয়ে পুলও তৈরী করা হয়েছে। সাণ্ডারল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে এরকম পুল আছে।

গৃহ নির্মাণে আজকাল যথেষ্ট অ্যালুমিনিয়াম লাগে। দরজা-জানালার ফ্রেম, ছিটকিনি, রেলিং, বেসিন ইত্যাদি আজকাল প্রায়ই অ্যালুমিনিয়ামের।

তড়িৎ-পরিবহনের জন্য তামাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তামা মহার্ঘ। সেইজন্য তামার পরিবর্তে আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের তার ও ক্যাব্‌ল দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যদিও তামার তুলনায় অ্যালুমিনিয়ামের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ৬০ শতাংশ। কিন্তু সহজলভ্য এবং সস্তা হওয়াতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারে খরচ অনেক কম পড়ে। ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক মোটর ইত্যাদির আবর্ত কুণ্ডলী (armature) সরু অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে তৈরী হচ্ছে। বস্তুত বৈদ্যুতিক কাজেই অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা সর্বাধিক।

অ্যালুমিনিয়ামের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা সমধিক। তাই রান্নার বাসনপত্র, কেটলী, সস্‌প্যান, ইত্যাদি প্রায়ই অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী। অ্যালুমিনিয়াম নমনীয় এবং খুব পাতলা পাত করা যায় বলে চকোলেট, টফি, ওষুধের ট্যাবলেট, ও অন্যান্য খাবারের আবরণ হিসাবে খুব ব্যবহার হয়। দুধের বোতলের ঢাকনা, ও খাবারের প্যাকেটের প্যাকিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়ামের চাদর থেকে ট্রাঙ্ক, বাক্স, সুটকেস, থালা-বাটি, কাপ-ডিস, ছাইদানি, পাউডারের

কৌটো ইত্যাদি তৈরী হয়। টেবিল-চেয়ারের ফ্রেমও অনেক সময় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী।

অ্যালুমিনিয়ামের বড় বড় আধার দুগ্ধ শিল্পে, মদ-চোলাইয়ের কারখানায়, ফরম্যালিন প্রস্তুতির সময় যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে।

অ্যালুমিনিয়াম থেকে আলোর প্রতিফলন খুব জোরালো। তাই মোটরের হেডলাইট, টর্চ, টেলিস্কোপ ইত্যাদিতে আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের দর্পণ ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে এলে তার উপর একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য অ্যালুমিনার ($Al_2O_3$) আবরণ পড়ে। এই আবরণ থাকার জন্য অ্যালুমিনিয়াম আর জলবায়ুতে ক্ষয়িত হয় না এবং মরচে পড়ে না। ১৮৯৩ সালে পিকাডিলি সার্কাসে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী যে Eros-এর মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল—সেটা আজও অম্লান অক্ষত রয়েছে। লোহার তৈরী বিদ্যুৎ পরিবহনের খুঁটি, টেলিগ্রাফের খুঁটি, জানালার শিক ইত্যাদিকে মরচে থেকে বাঁচাবার জন্য বিচূর্ণ অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। আতসবাজী এবং কোন কোন বিস্ফোরক তৈরী করতে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ লাগে।

এই সব নানা প্রয়োজনের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা প্রচুর। ১৯০০ সালে অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন ছিল ৭৫০০ টন আর ১৯৬৭ সালে সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে ৮২৮৫০০০ টন।

এত বিচিত্র গুণ থাকা সত্ত্বেও অ্যালুমিনিয়াম লোহার উপরে স্থান করে নিতে পরে নি। এর প্রধান কারণ, অ্যালুমিনিয়াম ধার নিতে পারে না। ক্ষুরধার অস্ত্র অ্যালুমিনিয়াম থেকে করা যায় না। মানুষের হিংসাবৃত্তির শেষ নেই, ক্ষমতার লোভে অপরের নিধনের জন্য, আধিপত্য বিস্তারের জন্য অস্ত্র চাই-ই। ছোরা, তলোয়ার, বন্দুক, বল্লম এসব ত অ্যালুমিনিয়াম থেকে হয় না। তা ছাড়া, সংসারের কাজের দা, কাস্তে, কুড়োল, কাটারি, করাত, পেরেক, স্ক্রু, বাটালি প্রভৃতি ধারাল জিনিস, অ্যালুমিনিয়াম থেকে তৈরী করা যায় না। তাই স্টীলের কদর বেশী।

অ্যালুমিনিয়ামের কয়েকটি যৌগের কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এর যৌগগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী ব্যবহার হয় ফটকিরি বা অ্যালাম। জল-পরিশোধনে, বস্ত্ররঞ্জনে, কাগজশিল্পে ফটকিরির প্রচুর চাহিদা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অনেক সময় অভ্র প্রয়োজন হয়, এই অভ্রও একটি অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ, পটাসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। আর একটি গাঢ় নীল খনিজ, লাপিস লাজুলি (সালফারযুক্ত সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট) রংয়ের জন্য যথেষ্ট সমাদৃত। উহার বিকল্পে আজকাল কৃত্রিম নীল,

আল্‌ট্রামেরিন (ultramarine) কোন কোন জিনিসকে সাদা করতে ও চুনকামে ব্যবহার হয়।

আলুমিনার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়। অ্যালুমিনা অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড প্রকৃতিতে স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। এর নাম কোরাণ্ডাম, এটি হীরকের মত শক্ত এবং হীরকের পরিবর্তে কাটার কাজে ব্যবহার হয়। বিচূর্ণ কোরাণ্ডাম পালিশের কাজে খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময়েই অ্যালুমিনা স্বচ্ছ রঙীন স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। এগুলি উজ্জ্বল মণিপাথর হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। যেমন, সবুজ রংয়ের পান্না (emerald), এবং রক্তিমবর্ণ চুনি বা পদ্মরাগ মণি (ruby)। নীলা বা নীলকান্তমণি (sapphire) বা ঈষৎ বেগুনি অ্যামেথিষ্টও স্ফটিকাকার অ্যালুমিনা। অ্যালুমিনার আর একটি মণিপাথর হচ্ছে হলদে পোখরাজ বা পুষ্পরাগ-মণি (topaz)। অতি সূক্ষমাত্রায় বিভিন্ন অক্সাইড মিশ্রিত থাকার জন্য এই সব রত্নের বিভিন্ন রঙ হয়।

## দস্তা

লোহা এবং অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় ব্যবহার অনেক কম হলেও দস্তা বা জিঙ্ক (Zn) নানা কাজে আমাদের প্রয়োজন হয়। দস্তার সংকর পিতল ত প্রাচীনকাল থেকে পরিচিত। মৌল হিসাবে দস্তাকে প্রথম চিহ্নিত করেন প্যারাসেলসাস।

যে বাদামী চকচকে আকরিক পাথর থেকে দস্তা প্রধানতঃ নিষ্কাশন করা হয়, তার নাম স্ফ্যালেরাইট বা জিঙ্ক-ব্লেণ্ড। এটি দস্তার সালফার-যুক্ত যৌগ, ZnS। এছাড়া অন্যান্য আকরিক হচ্ছে; ক্যালামাইন ($ZnCO_3$), হেমিমরফাইট ($Zn_2SiO_4$, $H_2O$), ফ্র্যাঙ্কলিনাইট (ZnO, $Fe_2O_3$)। জিঙ্কের খনিজগুলো প্রায়ই সীসার খনিজের সঙ্গে পাওয়া যায়। এই সকল আকরিকে খনিজ-মলই বেশী, অনেক সময়েই দস্তার পরিমাণ ৫-৮ শতাংশ মাত্র।

দস্তার সব চেয়ে বড় ভাণ্ডার রয়েছে কানাডাতে। তারপরের স্থান রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, পেরু। বর্মাতেও কিছু উৎকৃষ্ট জাতের দস্তার আকরিক আছে। আমাদের দেশে দস্তা অতি সামান্যই আছে। রাজস্থানের উদয়পুর জেলাতে দস্তা ও সীসার খনি রয়েছে, দস্তার পরিমাণ ৪-৫ শতাংশ। সেখানে দস্তা উৎপাদনের জন্য একটি বিগলন-যন্ত্র চালু হয়েছে। গুজরাটের বরোদা জেলায় এবং বিহারের সিংভূম অঞ্চলে কিছু দস্তার আকরিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বিশুদ্ধ দস্তা তৈরীর পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম ভারতেই আবিষ্কার হয় এবং পরে সেটা চীনে যায়। হিন্দুরাজা মদনপালের সময় দস্তাকে নতুন ধাতুরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।*

সালফাইড আকরিক জিঙ্ক ব্লেণ্ড থেকে ধাতুটি উৎপাদনের পদ্ধতি তামা বা সীসার অনুরূপ। প্রথমে তাপজারিত করে বিচূর্ণ আকরিককে জিঙ্ক অক্সাইডে পরিণত করা হয়; ($2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$)। পরে এই অক্সাইডের সঙ্গে কোকচূর্ণ মিশিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ছোট ছোট পাতনযন্ত্রে বিজারিত করা হয় ($ZnO + C \rightarrow Zn + CO$)। বাষ্পাকারে জিঙ্ক পাতনযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। এই বাষ্পকে শীতল অবস্থায় ঘনীভূত করে দস্তা সংগ্রহ করা হয়।

বিভিন্ন দেশে দস্তা উৎপাদনের পরিমাণ ( ১৯৬৭ )

| দেশ | দস্তা-উৎপাদন ( টন ) | দেশ | দস্তা-উৎপাদন ( টন ) |
|---|---|---|---|
| কানাডা | ১২৪৯০০০ | অষ্ট্রেলিয়া | ৪৪৫৮০০ |
| রাশিয়া | ৫৯০০০০ | পেরু | ৩৫০৫০০ |
| আঃ যুক্তরাষ্ট্র | ৫৪৯০০০ | ভারত (১৯৭৭) | ৩৮০০০ |

ঘরের ছাদে যে টিন ব্যবহার হয়, তাতে টিন ধাতু আদৌ নেই। লোহার উপরে দস্তার প্রলেপ দেওয়া থাকে। জলবায়ুতে মরচে পড়ে যাতে নষ্ট না হয় সেইজন্য দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়। কারণ জলবায়ুতে দস্তা আক্রান্ত হয় না। সেই একই কারণে, জলের বালতিগুলো দস্তালিপ্ত। এই দস্তালেপনের নাম Galvanisation। কখনও কখনও একটি আবদ্ধ পাত্রে একটি বস্তুকে বিচূর্ণ দস্তার সঙ্গে রেখে ৩৭৫°C পর্যন্ত তাপমাত্রায় কয়েক ঘণ্টা উত্তপ্ত করলে বস্তুটির উপরে দস্তার একটি দৃঢ় আবরণ পড়ে। এইরূপ প্রলেপনকে বলা হয় sherardisation।

অধিকাংশ দস্তা প্রয়োজন হয় নানারকম সংকর তৈরীতে। পিতল, বিশেষ ব্রোঞ্জ, জার্মান সিলভার, ডাচমেটাল প্রভৃতি তামার সঙ্গে যুক্ত সংকরধাতু। এদের বিষয় তামার অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দস্তার কোন কোন সংকর ছাঁচে ঢালাইয়ের পক্ষে খুব উপযুক্ত। 'মাজাক' সংকর ( ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম ও কপারের সংকর ) থেকে অনেক যন্ত্রাংশ তৈরী হয়। ছাপার ব্লক তৈরী করতেও জিঙ্ক লাগে। টর্চের ব্যাটারীতে এবং কোন কোন বৈদ্যুতিক সেলে দস্তার ইলেকট্রোড ব্যবহার হয়।

---

*'Discovery of Elements by Marie Elvira Weeks & Henry Leicester page 138, 7th Edn"

অত্যন্ত মিহি জিঙ্ক অক্সাইড যৌগ 'জিঙ্ক হোয়াইট' নামে সাদা রঙ হিসাবে প্রচুর ব্যবহার হয়। "লিথোপোন" নামে জিঙ্ক সালফাইড এবং বেরিয়াম সালফেটের মিশ্রণও একটি ভাল সাদা রঙ।

## টিন আর লেড

লৌহেতর ধাতুর মধ্যে দস্তা ছাড়া আরও যে দুইটি ধাতু নানা কাজে লাগে সে দুটি হচ্ছে, টিন ( রাং ) এবং লেড ( সীসা )। এই রাং-এর পরিবর্তে ইংরেজী নাম 'টিন' বেশী প্রচলিত, সুতরাং সেই নাম ব্যবহার করছি।

টিনের রাসায়নিক নাম হল স্ট্যানাম, চিহ্ন Sn। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধাতুদ্বয়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। টিনের সংকর ব্রোঞ্জ ত লৌহযুগের আগে নানা প্রয়োজনে ব্যবহার হত। তেমনি দুহাজার বছরেরও বেশী পুরানো অনেক লেডের তৈরী জিনিসও পাওয়া গেছে।

### টিন ঃ

প্রকৃতিতে টিনের পরিমাণ বেশী নয়—এর প্রধান আকরিক হল ক্যাসিটেরাইট ($SnO_2$), টিনের অক্সাইড। পেগমাটাইট, কোয়ার্জাইট শিলার মধ্যে এই টিন অক্সাইডের শিরা দেখা যায়। রোদ-জল-হাওয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিলাক্ষয়ের ফলে অনেক সময় এই খনিজ নদী-নালার জলস্রোতের তলায় এসে জমে। এই আকরিকে মলই বেশী, টিনের পরিমাণ ২-৭ শতাংশের বেশী নয়। টিনের বড় ভাণ্ডার রয়েছে মালয়েশিয়ায়। তারপরের স্থান বলিভিয়া, রাশিয়া, থাইল্যাণ্ড, চীন ইত্যাদি। এসব দেশে টিনের উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৬৭) ঃ—

| দেশ | উৎপাদন ( লক্ষ টন ) | দেশ | উৎপাদন ( লক্ষ টন ) |
|---|---|---|---|
| মালয়েশিয়া | ৮˙১ | থাইল্যাণ্ড | ২˙৫ |
| বলিভিয়া | ৩˙০ | চীন | ২˙২ |
| রাশিয়া | ২˙৮ | ইন্দোনেশিয়া | ১˙৫ |

ভারতে টিন প্রায় নেই বললেই হয়। বিহারের রাঁচি ও হাজারীবাগ অঞ্চলে এবং গুজরাটের পালানপুর অঞ্চলে কিছু ক্যাসিটেরাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের প্রয়োজনের টিন বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়।

খনিজ-মল যথাসম্ভব দূর করে পরাবর্ত চুল্লীতে বিচূর্ণ কোকের সঙ্গে ক্যাসিটেরাইটকে উচ্চ উষ্ণতায় বিজারিত করা হয়। গলিত অবস্থায় টিন বেরিয়ে আসে। পরে সেটাকে বিশোধন করে নিতে হয়।

উজ্জ্বল সাদা রংয়ের টিন ধাতুটি প্রায় লোহার মতই ভারী কিন্তু লোহার মত কঠিন নয়; অপেক্ষাকৃত নরম। টিনের গলনাঙ্ক বেশ নীচু, 232°C। এইজন্য টিন ও সীসার মিশ্রণ ঝালাইয়ের কাজে সর্বদা ব্যবহার করা হয়। টিন দিয়ে স্টীলের মত বা তামার মত সরু তার তৈরী করা যায় না। তবে টিনের ঘাতসহতা যথেষ্ট তাই খুব পাতলা টিনের পাত তৈরী করা সম্ভব। সেই সব পাত দিয়ে মলমের, টুথপেস্টের টিউব তৈরী করা হয়।

খুব ঠাণ্ডায় টিনের পাত রেখে দিলে সেটা ফুলে ফেঁপে উঠে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। বলা হয়, 'টিনের প্লেগ' হয়েছে। বস্তুতঃ টিনের রূপান্তর ঘটে। এটা ধূসর টিন।

আমরা যে নানা টিনের কৌটো ব্যবহার করি, সেগুলো মাইল্ড স্টীলের পাত দিয়ে তৈরী-তার উপরে টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। একে বলে টিনের প্রলেপন বা tin-plating। যাতে মরচে না পড়ে সেজন্য এটা করা হয়। কেরোসিনের টিনও এরূপ টিন-প্রলিপ্ত স্টীল দিয়ে তৈরী।

অনেক সময় ব্রোঞ্জ বা তামার পাত্রের উপরে বিচূর্ণ টিন ও একটু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ছড়িয়ে দিয়ে তাপিত করা হয়। এর ফলে পাত্রের উপর টিনের একটি দৃঢ় প্রলেপ পড়ে। একেই 'রাংয়ের কলাই' বা tinning বলে।

টিনের ধাতুসংকর অনেক এবং সেগুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

(১) ব্রোঞ্জ ঃ তামা ৯২%, টিন ৮% ( বাসনপত্র )

(২) মুদ্রা ঃ তামা ৯৫%, টিন ৪%, দস্তা ১% ( তাম্র মুদ্রা )

(৩) বেল মেটাল ঃ তামা ৮০%, টিন ২০% ( চামচ, বাসন, ঘণ্টা ইত্যাদি )

(৪) ঝালাই ধাতু ঃ সীসা ৫০% টিন ৫০% ( ঝালাইয়ের কাজে )

(৫) পয়টার (Pewter) ঃ সীসা ২০%, টিন ৮০% ( টেবিলের সরঞ্জামে )

(৬) ব্রিটানিয়া মেটাল ঃ অ্যাণ্টিমনি ১০%, টিন ৯০% ( ছুরি, কাঁটার জন্য )

(৭) ব্যাবিট মেটাল (Babbitt metals) ঃ টিন ৯০%, অ্যাণ্টিমনি ৭%, তামা ৩%।

"ব্যাবিট মেটাল"—এই সংকরটি মেশিনের "বেয়ারিং" (bearings) যন্ত্রাংশের জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

**লেড ঃ**

রোমানরা সেই যুগে জল সরবরাহের জন্য সীসার নল এবং জল রাখার জন্য সীসার চৌবাচ্চা ব্যবহার করত। যে সব মিস্ত্রী এগুলো তৈরী করত তাদের বলা হত প্লাম্বার ( এখনও ঐ নাম চলিত রয়েছে ) আর সীসাকে বলত, প্লাম্বাম (Plumbum, Pb)। রসায়নে সীসা এই নামেই প্রচলিত, চিহ্ন Pb।

সীসা মুক্তাবস্থায় মৌল হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। মাটির তলা থেকে সীসার খনিজ সংগ্রহ করতে হয়। সীসার প্রধান আকরিক গ্যালেনা ( লেড সালফাইড, PbS )। আরও দুইটি খনিজ থেকেও খানিকটা সীসা উৎপাদন করা হয়—সেগুলো হচ্ছে সেরুসাইট ( $PbCO_3$ ) এবং অ্যাংগ্লেসাইট ( $PbSO_4$ )। গ্যালেনা আকরিকটি প্রায়ই দস্তার আকরিক স্ফেরালাইটের ( ZnS ) সঙ্গে একত্র থাকে। দু'টি ধাতুই মূল্যবান এবং অনেক সময়েই এই ধাতুদ্বয়কে পাশাপাশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

গ্যালেনা থেকে সীসা উৎপাদনের পদ্ধতিটি অনেকটা তামা নিষ্কাশনের মত। আকরিকে লেড সালফাইড মোটামুটি ৮-১০ শতাংশ থাকে, বাকীটা আবর্জনা। তেল ও সাবান মিশ্রিত জলের স্রোতে বিচূর্ণ গ্যালেনাকে ভাল করে ধুয়ে নিলে বালু, মাটি ও অন্যান্য ময়লা থিতিয়ে যায়, তেলের সঙ্গে সালফাইড আলাদা হয়ে আসে। তখন গাঢ় আকরিকে লেড সালফাইডের পরিমাণ হয় প্রায় ৭০ শতাংশ। এই আকরিক চূর্ণকে বালতির মত চুল্লীতে নিয়ে বাতাসে তাপজারিত (roasting) করা হয়। অক্সাইড গ্যাস ($SO_2$) হয়ে সালফার চলে যায় এবং ছোট ছোট ডেলার আকারে লেড ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। এই সীসার অক্সাইড ও কোকের মিশ্রণকে তখন মারুত চুল্লীতে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহে বিজারিত করা হয়। চুল্লীর নীচে গলিত সীসা এসে জমে। এই সীসা পরে অবশ্যই তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশোধন করা হয়। সর্বদাই গ্যালেনা আকরিকে কিছু রূপা ( এবং কিঞ্চিৎ সোনা ) থাকে। বিশোধন করার সময় রূপা এবং সোনা উদ্ধার করা হয়। এইজন্যই বিশোধনের বিশেষ প্রয়োজন।

সীসার খনিজ অনেক দেশেই আছে। রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকাতেই বেশী সীসা উৎপাদিত হয়। কয়েকটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ (১৯৬৭) দেওয়া হল ঃ—

| দেশ | উৎপাদন (লক্ষ টন) | দেশ | উৎপাদন (লক্ষ টন |
|---|---|---|---|
| রাশিয়া | ৪.৪ | মেক্সিকো | ১.৯ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৪.২ | পেরু | ১.৭ |
| কানাডা | ৩.৪ | যুগোশ্লাভিয়া | ১.১ |
| আঃ যুক্তরাষ্ট্র | ৩.২ | বুলগেরিয়া | ১.১ |

আমাদের দেশে সীসার খনিজ বেশী নেই। রাজস্থানের উদয়পুর জেলার জাওয়ারেই আমাদের সীসার প্রধান উৎস। এখানে পুরনো যুগের বড় বড় খনি-খাদ দেখে মনে হয় সুদূর অতীত কালে এখান থেকে দস্তা ও সীসা সংগ্রহ করা হত। এখন ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এখানকার পাহাড় ও খনি থেকে গ্যালেনা উত্তোলনের ভার নিয়েছে। এ জায়গার আকরিকে রয়েছে রূপামিশ্রিত গ্যালেনা আর স্ফেলারাইট, আনুমানিক ২% সীসা আর ৫% দস্তা এতে রয়েছে। যথা-সম্ভব আবর্জনামুক্ত করে গাঢ় আকরিক পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিহারের টুংড়ুর বিগলন কারখানায়। সেখানে সীসা ও রূপা আলাদা করে উদ্ধার করা হয়।

রাজস্থান ছাড়া অন্ধ্রের গুন্টুর জেলার পাহাড়ে গ্যালেনা আকরিক রয়েছে তামা ও দস্তার খনিজের সঙ্গে। এখানেও পুরানো দিনের পরিত্যক্ত খনি-খাদ দেখা যায়। উড়িষ্যার সুন্দরগড় ও ময়ূরভঞ্জ জেলাতেও সীসার খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। গুজরাট, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটকেও সীসার খনিজ রয়েছে বটে, তবে সেগুলো নিম্নমানের।

সীসার বর্ণ ধূসর কিন্তু তার একটা ধাতব দ্যুতি আছে। সীসার সরু তার হয় না। কিন্তু পাত তৈরী হয়। লোহার চেয়ে দেড়গুণ ভারী হলেও ধাতুটি নরম। সীসার পাতকে সহজেই বাঁকানো যায় অথবা ছুরি দিয়ে কাটা যায়। যে 'লেড পেন্সিল' দিয়ে আমরা লিখি, তাতে কিন্তু সীসা নেই, আছে গ্র্যাফাইট (কার্বন)। সীসা কাগজে কালো দাগ কাটে তাই পেন্সিলের ওই নাম। নানারকম প্রয়োজনে সীসা ব্যবহার হয়।

যদিও আমাদের শরীরের উপরে সীসার বিষক্রিয়া আছে, তবু সীসার নল দিয়ে জল সরবরাহ করা হয় এবং সীসার চৌবাচ্চাও ব্যবহার করা হয়। তার কারণ জলের সংস্পর্শে এলে সীসার উপরে একটি অদ্রব ও দৃঢ় সাদা আস্তর পড়ে। তখন জলের সঙ্গে আর সীসার সংযোগ থাকে না, তাই জল বিষাক্ত হতে পারে না। তবুও জল সরবরাহ এবং খাদ্য বস্তুর সংরক্ষণে সীসা ব্যবহার না করাই ভাল।

আমাদের শরীরের পক্ষে সীসা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। একশ সিসি রক্তে যদি

২৫ মাইক্রোগ্রামের বেশী সীসা থাকে তবে সেটা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং কিড্‌নীকে আক্রমণ করে। রোমানদের রাজত্বকালে বহু-লোকের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা যেত, তার কারণ রোমানরা সেযুগে সীসার তৈরী পানপাত্র ব্যবহার করত। কিছুদিন আগে দেখা গেল সুইডেনে যারা বস্ত্রকলে কাজ করে তারা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, তারা তাঁতের জন্য যে কাটিম বা ববিন ব্যবহার করে সেগুলো সীসার এবং তা থেকে রক্তে বিষ সংক্রমিত হয়েছে। আজকাল সব দেশেই বিশেষতঃ সহরাঞ্চলে সীসাজনিত দূষণ অনেক বেড়ে গেছে। পেট্রোল চালিত গাড়ী থেকে যে ধোঁয়া বের হয় তাতে থাকে সীসা। বাতাস থেকে সেই সীসা ফুসফুসে যায় এবং সেখান থেকে রক্তে গিয়ে মিশে।

সীসার অধিকাংশ চাহিদা ছাপাখানার টাইপ তৈরীর জন্য এবং ঝালাইয়ের কাজে। টাইপ ধাতুতে সীসা ৮০%, অ্যাণ্টিমনি ১৫%, এবং টিন ৫% থাকে। ঝালাই ধাতু সংকরে সীসা ঃ টিন = ১ ঃ ১। টিনের মত সীসারও গলনাঙ্ক নীচু, ৩২৬°C। বৈদ্যুতিক ক্যাবলের আবরক হিসাবে অনেক সীসা প্রয়োজন হয়। বৈদ্যুতিক সেল এবং ব্যাটারীর তড়িৎদ্বার হিসাবেও যথেষ্ট সীসা দরকার। বন্দুকের বুলেটের জন্য সীসা অপরিহার্য। চায়ের প্যাকিংয়ের জন্য সীসার পাত ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লী এবং পারমাণবিক বিভাজনের পরীক্ষা যেসব প্রকোষ্ঠে করা হয় তার চারদিকে খুব পুরু সীসার দেওয়াল দিয়ে ঘিরে রাখতে হয় যাতে তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বেরিয়ে এসে ক্ষতি না করে। এজন্যও সীসা প্রয়োজন হয়। সীসা আবার তার কতগুলো যৌগ পদার্থ তৈরী করতেও ব্যয় হয়। এগুলো প্রায়ই রঙ (pigment) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঃ সাদা রঙ সফেদা বা white lead। গাঢ় লাল সীস-সিন্দুর বা (red lead)। এদের চাহিদা প্রচুর। এ ছাড়া দুইটি হলুদে রঙ লেড ক্রোমেট এবং মুদ্রাশঙ্খও (লেড মনোক্সাইড) ব্যবহার হয়। বিস্ফোরণ যাতে না হয় সেজন্য মোটর গাড়ীর গ্যাসোলিনের সঙ্গে লেড-টেট্রাইথাইল যৌগ মেশান হয়।

## ম্যাগনেসিয়াম (Mg.)

রুপার মত উজ্জ্বল এই ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন হামফ্রে ডেভি (১৮০৮)। নানা জিনিস তৈরী করার জন্য আমরা যে সব ধাতু ব্যবহার করি তাদের মধ্যে

ম্যাগনেসিয়াম সব চেয়ে হাল্কা। এর ঘনত্ব মাত্র ১·৭৪ গ্রাম প্রতি সিসি। অর্থাৎ স্টীল এর চেয়ে সাড়ে চারগুণ ভারী, এমনকি হাল্কা ধাতু অ্যালুমিনিয়ামও এর থেকে দেড়গুণ ভারী।

পৃথিবীতে ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে প্রচুর, তবে সবই বিভিন্ন যৌগরূপে। ভূত্বকে ধাতুদের মধ্যে ম্যাগনেসিয়ামের স্থান তৃতীয় ; এর পরিমাণ ভূত্বকের প্রায় দুই শতাংশ। শুধু লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর পরিমাণ এর চেয়ে বেশী। খনিজ পাথর ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$) এবং ডলোমাইট ($MgCO_3$, $CaCO_3$) এর সাধারণ আকরিক এবং প্রায় সব দেশেই অল্প বিস্তর আছে।

কিন্তু বেশীর ভাগ ম্যাগনেসিয়ামই উৎপাদন করা হয় সমুদ্রজলের দ্রাবিত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড থেকে। এক ঘন কিলোমিটার সমুদ্রজলে এক লক্ষ টনেরও বেশী ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে। সমুদ্র উপকূলের দেশগুলিতে সমুদ্রবারিই ম্যাগনেসিয়ামের উৎস। ১৮৩৩ সালে ফ্যারাডে ম্যাগনেসিয়াম ক্লেরোইডের তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটি তৈরী করেন। এরপরে ১৮৫২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী বুনসেন ঐ পদ্ধতিতে ম্যাগনেসিয়াম উৎপ াদনের জন্য বৈদ্যুতিক সেল উদ্ভাবন করেন। মোটামুটি সেই তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতেই সমুদ্রজল থেকে বিশুদ্ধ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সংগ্রহ করে তা থেকে আজকাল ধাতুটি তৈরী করা হচ্ছে। ১৯৪৩-এ আঃ যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে ১৮৪০০০ টন ম্যাগনেসিয়াম ধাতু তৈরী হয়েছে। পূর্ব জার্মানীর শুষ্ক হ্রদের স্টাসফার্ট-স্তূপে যে কার্নালাইট, কাইনাইট, কাইসেরাইট খনিজ লবণ রয়েছে. তা থেকেও ম্যাগনেসিয়াম উদ্ধার করা হয়।

যাদের সমুদ্র-উপকূল নেই তারা খনিজ ডলোমাইট পাথর থেকেই এই ধাতুটি উৎপাদন করেন। উচ্চতাপে ডলোমাইট পাথর থেকে প্রথমে ম্যাগনেসিয়া অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড তৈরী করে নেয়া হয়। এরপর অতি উঁচু তাপমাত্রায় (>২০০০°C) বিচূর্ণ কোক অথবা ফেরো-সিলিকনের সাহায্যে ম্যাগনেসিয়াকে বিজারিত করলে ম্যাগনেসিয়াম ধাতুটি বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসে। বাষ্পটিকে ঠাণ্ডা করে ম্যাগনেসিয়ামের তার বা রিবন তৈরী করা হয়।

ভারতে সমুদ্রবারি তো আছেই, তাছাড়া বিশাল ডলোমাইট ভাণ্ডার রয়েছে দেশের প্রায় সর্বত্র। কিন্তু তড়িৎ-বিশ্লেষণের জন্য প্রচুর সস্তা বিদ্যুৎ প্রয়োজন। সেটার অভাব রয়েছে। তাই এদেশে এখনও উৎপাদন সম্ভব হয় নি ; আমাদের বাইরে থেকেই ধাতুটি আনতে হয়।

ম্যাগনেসিয়াম সরাসরি ধাতু হিসাবে সামান্যই ব্যবহার হয়। বিচূর্ণ ম্যাগনেসিয়াম কোন কোন বিস্ফোরক বোমা তৈরীতে প্রয়োজন হয়। বাজী তৈরী

করতেও কিছু ম্যাগনেসিয়াম চূর্ণ ও রিবন লাগে। ধাতুটি আগুনে জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলো দেয়। টাইটেনিয়াম, বেরিলিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশনে ম্যাগনেসিয়াম প্রয়োজন হয়। ম্যাগনেসিয়াম ধাতু ঘাতসহ কিন্তু খুব শক্ত নয়। তাই দৃঢ় অথচ হাল্কা ধাতু-সংকর প্রস্তুতিতে ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার হয়। ম্যাগনেলিয়াম ও ডুরালুমিন এই দুইটি ধাতু-সংকরের কথা অ্যালুমিনিয়ামের আলোচনাতে বলা হয়েছে। উড়োজাহাজের কাঠামোতে এদের ব্যবহার যথেষ্ট।

ম্যাগনেসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সংকর যন্ত্রচালিত নৌকো, রেসের গাড়ি, সাইকেল আরোহীর টুপি, মুখোশ, ঘোড়ার পায়ের নাল, ক্যামেরার যন্ত্রাংশ প্রভৃতি তৈরী করার সময় ব্যবহার হয়। যেসব ক্ষেত্রে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে এই ধরণের ম্যাগনেসিয়াম সংকর ব্যবহার করা হয়; যেমন মাটির নীচের পাইপ-লাইনে বা ট্যাঙ্কে, জাহাজের খোলে।

ম্যাগনেসিয়ামের কয়েকটি যৌগেরও চাহিদা আছে। ডলোমাইট থেকে পাওয়া ম্যাগনেসিয়া অতি উচ্চতাপেও গলে না, এইজন্য চুল্লীর ভিতরের আস্তরে এটি ব্যবহার হয়। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং সালফেট বহুল ব্যবহৃত ঔষধ। গাছের পাতায় যে সবুজ ক্লোরোফিল কণা রয়েছে, সেটা ম্যাগনেসিয়ামেরই একটি জটিল যৌগ। ক্লোরোফিল না থাকলে সালোক-সংশ্লেষ হত না এবং তার ফলে সমস্ত জৈবজগৎ লোপ পেয়ে যেত।

স্পাইনেল নামক একটি খনিজ আছে, $MgAl_2O_4$। মনি পাথর হিসাবে বিশেষ সমাদৃত।

৫

# সংকর সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ধাতু

এ পর্যন্ত যাদের কথা বলা হল, সেসব ধাতু আমরা নানা কাজে লাগাই। এগুলো ছাড়াও আর কয়েকটি ধাতু আছে, যেমন, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ইত্যাদি যেগুলো বর্তমান যুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোহা বা তামার মত সরাসরি ধাতু হিসাবে এরা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ধাতু অন্য ধাতুর সঙ্গে, বিশেষতঃ স্টীলের সঙ্গে, মিশ্রিত হয়ে অনেক মূল্যবান এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় সংকর-ধাতুর সৃষ্টি করে। অসংখ্য রকম কাজে ঐসব সংকর-ধাতু লাগে। এই ধাতুগুলো প্রকৃতিতে কখনও মৌলাবস্থায় থাকে না। বিভিন্ন যৌগ আকরিক থেকে এদের নিষ্কাশিত করে নিতে হয়।

## ম্যাঙ্গানিজ (Mn)

সুইডেনের রাসায়নিক গ্যান (Gahn) ১৭৭৪ সালে ম্যাঙ্গানিজ আবিষ্কার করেন। পৃথিবীতে নানারকম ম্যাঙ্গানিজ খনিজ রয়েছে; এদের অধিকাংশই অক্সাইড। বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকরিক হচ্ছে; (১) সাইলোমিলেন ($MnO_2$, $H_2O$), (২) পোলিয়ানাইট ($MnO_2$), (৩) পাইরোলুসাইট ($MnO_2$), (৪) ম্যাঙ্গানাইট ($Mn_2O_3, H_2O$), (৫) ব্রনাইট ($3\ Mn_2O_3$, $MnSiO_3$), ইত্যাদি। ভূত্বকে ম্যাঙ্গানিজ ০'০৮৫% আছে। উপরের মাটি সরিয়ে উন্মুক্ত খাদ কেটে আকর সংগ্রহ করা হয়। রাশিয়াতেই সর্বাধিক ম্যাঙ্গানিজ খনিজ রয়েছে। তারপরের স্থান যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, গ্যাবন, ব্রাজিল, চীন। অর্থাৎ ভারতের স্থান তৃতীয়। বর্তমানে ভারতে বছরে গড়ে বিশ লক্ষ টন আকরিক তোলা হয়। আমাদের লোহার কারখানার চাহিদা মিটিয়েও অনেকটা আকরিক বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এদেশের ম্যাঙ্গানিজ খনিজ বেশ উন্নত শ্রেণীর। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ছিন্দোয়ারা ও নাগপুর অঞ্চলে, কর্ণাটকের শিমোগা ও চিতল দুর্গ অঞ্চলে, গোয়ার পেরনেম ও বারদেতে, গুজরাটের বরোদা, পাঁচ মহল এবং শিবরাজপুর অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর ও কোরাপুট জেলায়, বিহারের গুয়া, সিংভূম ও হাজারীবাগ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ রয়েছে। একটা হিসাবে দেখা গেছে ভারতে মোট ম্যাঙ্গানিজ খনিজের ভাণ্ডার রয়েছে ১৮৭০ লক্ষ টন।

আকরিক থেকে থারমাইট পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের সাহায্যে ম্যাঙ্গানিজ ধাতু নিষ্কাশিত করা হয় ( পৃঃ ৩৮ )। ম্যাঙ্গানিজের সব আকরিকেই অল্পাধিক লোহার অক্সাইড থাকে। এজন্য উৎপাদিত ধাতু বস্তুতঃ ম্যাঙ্গানিজ ও লোহার মিশ্রণ, এর নাম 'ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ'। ম্যাঙ্গানিজ ধাতু হিসাবে সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। 'ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ' গলিত স্টীলে মিশিয়ে উন্নত মানের ম্যাঙ্গানিজ-স্টীল সংকর তৈরী করা হয়। প্রায় সমস্ত ভাল স্টীলেই কিছু ম্যাঙ্গানিজ মেশান হয়। ম্যাঙ্গানিজ অক্সিজেন বিতাড়িত করে স্টীলের কঠোরতা বাড়ায়। রেলের পাটি, ঘর্ষণ-যন্ত্র ও অন্যান্য শক্ত-কাজের জন্য ম্যাঙ্গানিজ-স্টীল বিশেষ প্রয়োজন। প্রতি টন স্টীলে ৫～৭ কেজি ম্যাঙ্গানিজ মেশান হয়। ম্যাঙ্গানিজ ধূসর সাদা কঠিন ধাতু ( ঘনত্ব ৭·২, গলনাঙ্ক ১২৬০°C)।

স্টীল ছাড়াও ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য ধাতুসংকর আছে। ম্যাঙ্গানিজ-সংকর (Cu ৮৪%, Mn ১২%, Ni ৪%) তড়িৎযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজ-ব্রোঞ্জ (Mn ৪%, Cu ৬০%, Zn ৩৫%, Fe ১%) খনিতে এবং সমুদ্রে ব্যবহার-উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণে লাগে।

বিশুদ্ধ পাইরোলুসাইট বা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে, কাচশিল্পে, দেশলাই তৈরী করতে প্রয়োজন হয়। পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যৌগটি জীবানুনাশক, জারক এবং বিরঞ্জকরূপে ব্যবহৃত হয়।

## নিকেল (Ni)

প্রায় তিন শতক আগে জার্মানীতে তামার আকরিকের সঙ্গে কিছু পরিমাণ আর একটি পাথর পাওয়া যেত, কিন্তু তা থেকে কখনও তামা বের করা সম্ভব হত না। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল, Kupfer-nickel অর্থাৎ "শয়তানের তামা" ( Nick, শয়তান )। এটাকে বিশ্লেষণ করে সুইডেনবাসী ক্রনস্টেড (১৭৫১) নিকেল আবিষ্কার করেন। নিকেলের গুণাগুণ অনেকটাই লোহার অনুরূপ। লোহার মতই নিকেল বেশ মজবুত ও শক্ত, উচ্চ উষ্ণতায় গলে (১৪৫৪°C), চুম্বকধর্মী ইত্যাদি। তবে নিকেলের একটি বিশেষ গুণ আছে, নিকেল লোহার মত মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায় না। বিশুদ্ধ নিকেল রূপার মত সাদা, প্রসার্যমান, ঘাতসহ ধাতু।

পৃথিবীতে নিকেলের পরিমাণ বেশী নয়। এর নানা খনিজ হল ঃ— (১) পেন্টল্যানডাইট (Ni, Fe) S, (২) গারনিয়েরাইট (Ni, Mg) $SiO_3$, $xH_2O$ (৩) নিকোলাইট (NiAs) (৪) নিকেল-গ্লান্স (NiAsS) ইত্যাদি। এর

মধ্যে প্রথম দু'টি খনিজই প্রধান আকরিক। ধাতুটিকে এই দু'টি আকরিক থেকে এক বিশেষ রকমের জটিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করতে হয়। সর্বাধিক পরিমাণ নিকেল সংগ্রহ হয় কানাডা থেকে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ ক্যালিডোনিয়া দ্বীপ থেকে। ভারতে নিকেল অতি সামান্যই আছে। এদেশে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিকেল-আকরিক রয়েছে উড়িষ্যার কটক ও ময়ূরভঞ্জ জেলায়—নিকেলের পরিমাণ অনধিক ১%। বিহারের সিংভূমের তামার আকরিকে এবং রাজস্থানের ক্ষেত্রীর তামার আকরিকে সামান্য একটু নিকেল রয়েছে। আমাদের প্রয়োজনের নিকেল সবটাই কানাডা থেকে আসে।

ধাতু হিসাবে বিশুদ্ধ নিকেলের প্রয়োগ সামান্যই। মরিচা রোধ করার জন্য এবং উজ্জ্বলতা বাড়াবার জন্য অনেক সময় স্টীলের ও তামার জিনিসের উপর বৈদ্যুতিক উপায়ে নিকেলের প্রলেপ দেওয়া হয়। EPNS [Electro-plated Nickel Silver] নামে যে সুদৃশ্য ও রূপার মত ঝকঝকে বাসনপত্র, কাঁটাচামচ, ফুলদানি ইত্যাদি বাজারে প্রচুর পাওয়া যায় সেগুলো জার্মান-সিলভারের উপর ঐ রকম প্রলেপ দেওয়া। কিছু কিছু রাসায়নিক শিল্পে যেমন বনস্পতি উৎপাদনে বিচূর্ণ নিকেল লাগে। কোন কোন ব্যাটারীর তড়িৎদ্বার নিকেলের।

কিন্তু ৯০ শতাংশেরও বেশী নিকেল নানারকম ধাতু-সংকর তৈরী করতে ব্যয় হয়। এখানে মাত্র কয়েকটি নিকেলজাত সংকরের কথা বলা হচ্ছে।

**নিকেল-স্টীল :** নিকেল সংযোগে স্টীলের দৃঢ়তা, কাঠিন্য এবং প্রসার্যতা বাড়ে। নিকেল-স্টীল স্থিতিস্থাপক এবং মরিচারোধী হয়। সচরাচর ২~৫% নিকেল মেশান হয়। এই নিকেল-স্টীল বর্ম, বিমান-যন্ত্রাংশ, মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশ, ভারী বন্দুক ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হয়।

**ইনভার :** ৩৬% নিকেল যুক্ত এই স্টীলের প্রসারাঙ্ক খুব কম, অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ালেও আয়তনে বাড়ে না। এটা মরিচারোধীও বটে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম, স্কেল এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

**প্লাটিনাইট :** ৪৬% নিকেল মিশ্রিত ইস্পাতের ধাতুসংকরের প্রসারাঙ্ক ঠিক প্লাটিনামের মত, সেইজন্য এই নাম। অথচ প্লাটিনামের চেয়ে সস্তা। বৈদ্যুতিক বাল্‌বে এবং রেডিয়োর ভাল্‌বে এটা ব্যবহার করা হয়।

তামার সঙ্গে নিকেলের মূল্যবান ধাতুসংকর তৈরী হয়। **নিকেল সিলভার বা জার্মান সিলভার** ( Cu ৫০%, Ni ২৫%, Zn ২৫% ) গৃহস্থালীর নানা জিনিসপত্র ও গহনা ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। **মোনেল মেটাল :** ( Cu ৩০%, Ni ৬৭%, Mn ৩% ) অত্যন্ত ঘাতসহনশীল এবং উচ্চ তাপমাত্রায়ও অবিকৃত

থাকে। উন্নত মেশিন, জাহাজের প্রপেলার, ভাল্‌ভ, টারবাইন ব্লেড, দ্রুত চলনশীল যন্ত্রাংশে মোনেল মেটালের চাহিদা। **কিউপ্রো-নিকেল** (২০% Ni) বুলেটের জ্যাকেটে ব্যবহার হয়। **প্লাটিনয়েড** (Cu ৬০%, Zn ২৪%, Ni ১৬%) এবং **কনস্টানটিন** (Cu ৬০%, Ni ৪০%) এই দুইটি সংকর-ধাতু তড়িৎ-রোধকে এবং থার্মোকাপলে ব্যবহার করা হয়। অনেক মুদ্রার একটি উপাদান নিকেল। নাইক্রোম (Ni ৬০%, Cu ১৫%, Fe ২৫%) সংকরটি বৈদ্যুতিক চুল্লীর তার নির্মাণের জন্য বিশেষ সমাদৃত। স্থায়ী চুম্বকের জন্য অ্যালনিকোর কথা আগেই বলা হয়েছে।

## ক্রোমিয়াম (Cr)

সাইবেরিয়া থেকে পাওয়া লাল খনিজ-শিলা ক্রোকোসাইট বিশ্লেষণ করে ফরাসী বিজ্ঞানী ভ্যাকুলিন (১৭৯৭) ক্রোমিয়াম ধাতুটি আবিষ্কার করেন। ক্রোমিয়ামের যৌগগুলি নানারকম সুন্দর গাঢ় রঙের—সেইজন্য এই নাম, গ্রীক Chroma শব্দটির অর্থ রং। ক্রোমিয়াম ধাতুটি উৎপাদনের জন্য সর্বত্র তার একমাত্র আকরিক ক্রোমাইট ($FeO, Cr_2O_3$) ব্যবহার করা হয়। ক্রোমাইট আকরিক বেশী পাওয়া যায় রাশিয়া, দঃ আফ্রিকা, রোডেসিয়া, তুরস্ক, ফিলিপাইনস্‌, কিউবা, নিউ ক্যালেডোনিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতেও কিছু ক্রোমাইট রয়েছে। ভারতের প্রধান ভাণ্ডার উড়িষ্যার কটক, কেওঞ্জর, ঢেংকানল জেলায়। বিহার, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রেও ক্রোমাইট খনিজ রয়েছে। এসব জায়গায় খনন চলছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে বছরে গড়ে ৩～৪ লাখ টন এই আকরিক খনি থেকে তোলা হচ্ছে।

ক্রোমাইট পাথর উচ্চ উষ্ণতাতেও গলে না। তাই ফার্নেসের ভিতরের অগ্নিসহ আস্তরের জন্য এটি ব্যবহার হয়।

ক্রোমাইট আকরিক থেকে প্রথমে বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে লোহা দূর করে বিশুদ্ধ ক্রোমিক অক্সাইড ($Cr_2O_3$) তৈরী করা হয়। এই ক্রোমিক অক্সাইডকে থারমিট পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে উচ্চ উষ্ণতায় বিজারিত করলে ক্রোমিয়াম ধাতুটি নিষ্কাশিত হয়ে আসে। ক্রোমিয়াম নীলাভ সাদা কঠিন ও ঘাতসহ ধাতু, ঘনত্ব ৭·২, গলনাঙ্ক ১৮৩০°C।

ক্রোমিয়াম ধাতুর প্রায় সবটুকুই ইস্পাতের বিশেষ ধাতুসংকর তৈরী করার জন্য ব্যয় হয়; সামান্য কিছুটা বৈদ্যুতিক প্রলেপ (electroplating) দিতে লাগে। ক্রোমিয়াম প্রলিপ্ত হলে ধাতুর ক্ষয় রোধ হয় এবং তা রূপার মত উজ্জ্বল দেখায়।

ক্রোমিয়াম মিশালে ইস্পাত খুব শক্ত হয়। এরকম ইস্পাত ঘর্ষণে ক্ষয় হয় না এবং মরিচারোধী হয়।

১৯১৩ সালে শেফিল্ডে হ্যারি বেয়ারলী মজবুত বন্দুকের নলের জন্য বিভিন্ন ধাতু মিশিয়ে নানারকম ইস্পাত-সংকর তৈরী করে পরীক্ষা করছিলেন। যেগুলো উপযুক্ত নয় এবং পছন্দ হয় নি সেগুলো তিনি বাইরে ফেলে রেখেছিলেন। কিছুদিন পরে দেখতে পেলেন, ফেলে-রাখা সংকরগুলো মরচে ধরে নষ্ট হয়েছে। শুধু যে ইস্পাত-সংকরগুলোতে ক্রোমিয়াম মিশিয়েছিলেন সেগুলোতে একটুও মরচে পড়ে নি; আগের মতই উজ্জ্বল রয়েছে। এভাবেই ক্রোম-স্টীল তথা স্টেনলেস স্টীলের সূত্রপাত। আজকাল (৫~১০%) ক্রোমিয়াম মিশ্রিত ইস্পাতসংস্কর বর্ম, যুদ্ধাস্ত্র, দ্রুতগতি যন্ত্রাংশ, মোটরের ইঞ্জিন প্রভৃতিতে ব্যবহার হয়। কখনও কখনও প্রয়োজন মত কিছু নিকেল, টাংস্টেন বা ভ্যানাডিয়ামও সঙ্গে দেওয়া হয়। ১২ শতাংশের বেশী ক্রোমিয়ামযুক্ত ইস্পাত স্টেনলেস স্টীল হিসাবে বাসনপত্রের জন্য অধুনা বহুল ব্যবহৃত। প্রায়ই এতে সামান্য নিকেল থাকে। উড়োজাহাজের এবং রেলের উন্নতমানের ইঞ্জিনের জন্য ২০~২৫% ক্রোমিয়াম, ৭~১০% নিকেলযুক্ত স্টেনলেস ইস্পাত ব্যবহার হয়।

ক্রোমিয়ামের আরও সংকর-ধাতু আছে। যেমন, লেদ-মেশিনে শক্ত জিনিষ কাটার জন্য যে ধারাল ছুরি বা করাত ব্যবহার হয় সেটা "স্টেলাইট" নামে সংকর ধাতু; কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম এবং টাংস্টেনের সংকর। জেট ইঞ্জিন, গ্যাস-টারবাইনের যন্ত্রাংশ তৈরীতে স্টেলাইট প্রয়োজন হয়। নাইক্রোমের কথা আগেই বলা হয়েছে ( পৃ ৮৪ )।

## টাংস্টেন (W)

এই ধাতুটির রাসায়নিক নাম উলফ্রাম, তাই চিহ্ন (W)। ১৭৮৩ সালে স্পেনদেশের বিজ্ঞানী দুই ভাই—ফস্টো দ্য এলুয়ার এবং জুয়ান যোসেফ দ্য এলুয়ার—এই ধাতু আবিষ্কার করেন। টাংস্টেনের দুইটি মাত্র উল্লেখযোগ্য আকরিক আছে ঃ শীলাইট ( ক্যালসিয়াম টাংস্টেট, $CaWO_4$ ) এবং উলফ্রেমাইট ( ম্যাঙ্গানিজ টাংস্টেট, Mn (Fe) $WO_4$)। এই আকরিক চীন, রাশিয়া, কোরিয়া আঃ যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশী সংগৃহীত হচ্ছে। ব্রহ্মদেশ থেকেও এই উলফ্রেমাইট অনেক রপ্তানি হয় ইউরোপে। ভারতে টাংস্টেন আকরিক সামান্যই আছে এবং সেটা পাওয়া যায় সিংভূম, ত্রিচিনপল্লী, রাজস্থানের যোধপুরে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়াজেলার ছেঁদাপাথর থেকে কিঞ্চিৎ টাংস্টেন উদ্ধার করা হয়। আমাদের

প্রয়োজনের প্রায় সবটুকু টাংস্টেন বাইরে থেকে আনতে হয়। ১৯৭৭-এ দেশে টাংস্টেন খনিজ তোলা হয়েছে মাত্র ৪৩,০৪৪ টন।

টাংস্টেন আকরিককে গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে ফুটালে টাংস্টেন অক্সাইড ($WO_3$) পাওয়া যায়। উচ্চ উষ্ণতায় এই অক্সাইডকে কোক দিয়ে বিজারিত করে ধাতুটি উদ্ধার করা হয়।

টাংস্টেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি দুর্গল ধাতু। অতি উচ্চ তাপমাত্রাতেও এটিকে গলানো দুষ্কর। গলনাঙ্ক ৩৪১০°C। এর ঘনত্বও খুব বেশী, ১৯.৩। অ্যাসিডে এই ধাতু আক্রান্ত হয় না। এর প্রসার্যতা খুব বেশী—অত্যন্ত সরু টাংস্টেনের তার তৈরী করা যায়। প্রায় সমস্তটুকু টাংস্টেনই কঠোর ইস্পাত-সংকর তৈরী করার জন্য ব্যবহার হয়। টাংস্টেন ইস্পাত-সংকর অত্যন্ত কঠোর, ক্ষয়হীন এবং উচ্চ উষ্ণতায় নির্বিকার। এইজন্য টাংস্টেন-স্টীল ধাতু-কাটার বা পাথর-কাটার ধারালো যন্ত্রপাতিতে প্রয়োজন হয়। টাংস্টেন ও কার্বনের যৌগ টাংস্টেন কার্বাইড স্টীলের থেকেও কঠোর এবং ধারালো যন্ত্রপাতি তৈরী করতে ব্যবহার হয়। আর একটি মূল্যবান সংকর "স্টেলাইটের" কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৮৫)। মিসাইলে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় প্রযুক্ত যন্ত্রাংশের জন্য টাংস্টেন অপরিহার্য। বিজলী বাতির ফিলামেণ্ট, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, এক্স-রে ও ক্যাথোড-রে টিউব, ঝালাই করার ইলেকট্রোড, টেলিভিসনের যন্ত্রাংশ—এসবের জন্যও টাংস্টেনের যথেষ্ট চাহিদা।

## কোবাল্ট (Co)

স্বভাব একরকম বলে লোহা, কোবাল্ট এবং নিকেল এই তিনটি ধাতুকে রসায়নবিদেরা এক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। কোবাল্ট ধাতুটি অনেকটা লোহার অনুরূপ। কোবাল্ট সাদা দ্যুতিসম্পন্ন ধাতু, লোহার চেয়েও শক্ত এবং ভারী (ঘনত্ব, ৮.৭), এর গলনাঙ্কও বেশ উঁচু, ১৪৯৫°C। কোবাল্টও চুম্বকধর্মী। তবে কোবাল্ট জলে বাতাসে মরচে পড়ে ক্ষয়ে যায় না। সুইডেনের রসায়নবিদ্ ব্রাণ্ড ১৭৩৭ সালে কোবাল্ট আবিষ্কার করেন। প্রকৃতিতে অবশ্য লোহার তুলনায় কোবাল্ট অতি সামান্যই রয়েছে; ভূত্বকে লোহা ৫.০%, নিকেল ০০.২% আর কোবাল্ট ০.০০১% আছে।

কোবাল্টের আকরিক হল: (১) লিয়ানাইট ($Co_3S_4$), (২) স্মলটাইট ($CoAs_2$), (৩) কোবাল্টাইট ($CoAsS$) ইত্যাদি। অবশ্য এদের সঙ্গে অন্যান্য অনেক ধাতুর যৌগ মিশ্রিত থাকে। রোডেসিয়া এবং কাটাঙ্গার তাম্র-আকরিকের

সঙ্গে এবং অণ্টারিয়োর রূপার আকরিকের সঙ্গে অনেকটা কোবাল্ট সালফাইড থাকে। এই উৎসগুলো থেকেই প্রধানতঃ কোবাল্ট উপজাত ধাতুরূপে সংগৃহীত হয়। ভারতে কোবাল্টের আকরিক প্রায় নেই। ক্ষেত্রীর তামার খনিজের সঙ্গে সামান্য কোবাল্ট খনিজ রয়েছে। এই খনিজ উদ্ধার করে রাজস্থানের শিল্পীরা এনামেলের নীল রঙের জন্য ব্যবহার করে। সিকিমের তামার আকরিকের সঙ্গেও কিছু কোবাল্ট আছে। এদেশের প্রয়োজনের সবটুকু কোবাল্ট ধাতুই বিদেশ থেকে আনা হয়।

লোহা বা তামার মত কোবাল্ট ধাতুর সরাসরি ব্যবহার নেই। সবটা কোবাল্ট সংকর-ধাতু তৈরীতে খরচ হয়, বিংশষতঃ ইস্পাতের সঙ্গে মিশিয়ে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে এর সংকর ধাতু 'অ্যালনিকো' থেকে স্থায়ী চুম্বক তৈরী হয় ( পৃষ্ঠা ৬৯ )। 'স্টেলাইট' সংকর-ধাতুর কথা ক্রোমিয়ামের আলোচনার সময় বলা হয়েছে।

কাচের সঙ্গে প্লাটিনাম সহজেই জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রসারাঙ্কের (coefficient of expansion) অনেক ব্যবধান থাকার জন্য অন্যান্য ধাতু কাচের সঙ্গে জোড়া লাগে না। অধুনা কোবাল্টের একটি সস্তা সংকর-ধাতু মহার্ঘ প্লাটিনামের স্থান নিয়েছে, কাচের সঙ্গে জোড়া লাগাতে। এই সংকর-ধাতুতে আছে Co ১৮%, Ni ২৮%, Fe ৫৪%।

নিকেল এবং ইস্পাতের সংকর-ধাতু ইনভারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ; এর প্রসারাঙ্ক খুবই কম। আরও উন্নত ধরনের সম্পূর্ণ মরিচারোধী ইনভার আবিষ্কৃত হয়েছে ; এতে আছে লোহা ৩৬·৫%, ক্রোমিয়াম ৯·৫% এবং কোবাল্ট ৫৪%।

কোবাল্টের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কোবাল্ট 60 থেকে বীটা-রশ্মি এবং জোরালো গামা-রশ্মি বের হয়। এইজন্য ক্যান্সারের চিকিৎসায় আজকাল রেডিয়ামের পরিবর্তে এই কোবাল্ট 60 ব্যবহার হচ্ছে। ভাইটামিন $B_{12}$-এর অভাবে প্রাণীদেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। সুস্থদেহের জন্য $B_{12}$ অপরিহার্য। এই ভাইটামিন অণুতে কোবাল্ট আছে। সুতরাং আমাদের দেহের জন্য একটু কোবাল্টের প্রয়োজন রয়েছে।

অনেকদিন থেকেই দেখা গিয়েছিল যে অনেক জায়গায় গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশু যথেষ্ট ঘাস-পাতা খেয়েও পুষ্টির অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত। মনে করা হত কোন জীবাণুর সংক্রমণই এরূপ দুর্বলতার কারণ। কিন্তু নানা পরীক্ষার পর ১৯৩৫ সালে প্রমাণ হয়েছে, ওরকম পুষ্টির অভাবের মূলে রয়েছে ঐসব পশুচারণ-ভূমিতে কোবাল্টের অভাব। এই কারণে সেখানকার ঘাসেও কোবাল্ট

ছিল না। অতি সামান্য যেটুকু কোবাল্ট প্রয়োজন সেটুকু না পেয়ে পশুরা ভুগছিল। জৈব জগতের পুষ্টির ক্ষেত্রে কোবাল্টের এক ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুস্থদেহের জন্য অতিসামান্য একটু কোবাল্ট প্রয়োজন। আমাদের খাদ্যের মধ্যে চাল, গম, আলু, মটর, ভুট্টা প্রভৃতিতে ০'০৫ ppm-এরও কম কোবাল্ট আছে। বাঁধাকপি, শাক, লেটুস, ডুমুর ইত্যাদিতে রয়েছে ০'২ ppm-এর বেশী। ( ১ ppm = দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ )।

## ভ্যানাডিয়াম (V)

ভ্যানাডিয়াম একটি বিরল ধাতু এবং পৃথিবীতে সামান্যই আছে। যেটুকু আছে তার অনেকটাই নানা বস্তুর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, বক্সাইট এবং আরও অনেক শিলাতে ভ্যানাডিয়াম কিছু থাকে। ১৮০১ সালে মেক্সিকোর আঁদ্রে ডেল রিয়ো একটি সীসার আকরিককে এই ধাতুটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন "এরিথ্রোনিয়াম"। কিন্তু এটি একটি মৌলিক ধাতু কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। পরে সুইডেনে একটি লোহার খনিজে সেফস্ট্রম এই ধাতুটি আবার আবিষ্কার করেন (১৮৩০)। সুইডেনের সৌন্দর্যের দেবী হলেন "ভ্যানাডিস্"। এই ধাতুটির অনেক যৌগের রঙ অতিসুন্দর বলে তিনি ধাতুটির নামকরণ করেন, "ভ্যানাডিয়াম"।

পেরুর উঁচু পাহাড়ে পাওয়া "পেট্রোনাইট", ভ্যানাডিয়ামের একটি প্রধান আকরিক। এটা ভ্যানাডিয়ামের সালফাইড। অন্যান্য আকরিক হল ঃ কার্নোটাইট $[K_2(UO_2)_2(VO_4)_3, 3H_2O]$; ভ্যানাডিনাইট $[3Pb_3\ (VO_4)_2, PbCl_2\ ]$। ভ্যানাডিয়ামের খনিজ রয়েছে ফিনল্যান্ড, উরাল পর্বত, স্পেন, দঃ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, রোডেসিয়া প্রভৃতি দেশে। ভারতে যে সামান্য ভ্যানাডিয়াম আছে সেটা প্রায়ই ম্যাগনেটাইট লৌহ-আকরের সঙ্গে থাকে। বিহারের ধলভূম অঞ্চলে, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে এবং কেওঞ্ঝরে এরকম ভ্যানিডিয়ামযুক্ত ম্যাগনেটাইট রয়েছে। কর্ণাটকের হাসানে, তামিলনাড়ুর নীলগিরিতেও কিছু ভ্যানাডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধাতুটি অবশ্য আমাদের দেশে উৎপাদন করা হয় না।

ভ্যানাডিয়াম অতি উচ্চ তাপমাত্রায় গলে, গলনাঙ্ক ১৮৯০°C। এটি অত্যন্ত কঠোর এবং ক্ষার বা অম্লদ্বারা মোটেই আক্রান্ত হয় না। জলবায়ুতেও মরচে পড়ে না। ধাতু হিসাবে ভ্যানাডিয়ামের ব্যবহার প্রায় নেই। বিভিন্ন সংকর-ধাতুর জন্যই এর প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি, টাংস্টেন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতির সংমিশ্রণে ইস্পাতের

কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। ঐ বিষয়ে ভ্যানাডিয়াম অন্যতম। অতিরিক্ত রকম শক্ত ইস্পাত প্রয়োজন হলে ইস্পাতের সঙ্গে অল্প পরিমাণে ভ্যানাডিয়াম মেশান হয়। ভ্যানাডিয়াম-স্টীল সংকর-ধাতুটি ভারী যন্ত্রপাতি, উড়োজাহাজ এবং গাড়ীর কাঠামো, প্রভৃতির জন্য ব্যবহার হয়। ভ্যানাডিয়াম-ব্রোঞ্জ দিয়ে উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ তৈরী হয়। নিউট্রন-রশ্মি সহজে ভ্যানাডিয়ামের পাতের ভিতর দিয়ে যেতে পারে বলে পারমাণবিক রি-অ্যাকটারে কিছু ভ্যানাডিয়াম লাগে।

ভ্যানাডিয়ামের পেন্টোক্সাইড ($V_2O_5$) নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি উৎকৃষ্ঠ প্রভাবক (catalyst)। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন প্রত্যেক দেশেরই একটি মূল শিল্প। এই অ্যাসিড তৈরী করতে এতদিন মহার্ঘ প্লাটিনাম-চূর্ণ প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করতে হত। আজকাল প্লাটিনামের পরিবর্তে ভ্যানাডিয়াম পেন্টোক্সাইড প্রভাবক ব্যবহার হয়। ন্যাপথলিন থেকে থলিক অ্যানাহাইড্রাইড যৌগটি তৈরী করার সময়েও এই প্রভাবক ব্যবহৃত হয়। থলিক-অ্যানাহাইড্রাইড নানা শিল্পে প্রয়োজন হয়। ভ্যানাডিয়াম যৌগ কীটনাশকরূপে, ফটোগ্রাফীতে, কাচশিল্পে এবং কোন কোন রঞ্জক প্রস্তুতিতেও লাগে।

## মলিবডিনাম (Mo)

ভ্যানাডিয়ামের চেয়েও বিরল এই মলিবডিনাম ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন সুইডেনের হিয়েল্‌ম্‌ (Hjelm, 1781)। এর আকরিক হল ঃ মলিবডিনাইট ($MoS_2$) এবং উলফেনাইট (Pb, MoO)। নরওয়ে, মেক্সিকো, কোরিয়া, চীন, আঃ যুক্তরাষ্ট্রে এই আকরিক পাওয়া যায়। ভারতে মলিবডিনাম আকরিক নেই বললেই হয়; কোন কোন জায়গায় সামান্য দেখা যায়। যেমন, বিহারের হাজারীবাগের তামা-সীসার খনিজের সঙ্গে, অন্ধ্রের গোদাবরী জেলার বা রাজস্থানের কিষণগড় জেলার পেগমেটাইটের সঙ্গে।

এই ধাতুটি (ঘনত্ব ১০'২) প্রায় ২৬১০°C-এ গলে এবং অনেক ধাতুর সঙ্গে মিশে সহজেই সংকর-ধাতু তৈরী করে। এত উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট ধাতু খুব কমই আছে। কাঠিন্য বাড়াবার জন্য এবং ক্ষয়রোধ করার জন্য ইস্পাতের সঙ্গে এই ধাতুটি অনেক সময় মেশান হয়। তার সঙ্গে প্রায়ই ক্রোমিয়াম নিকেলও থাকে। সেইসব ইস্পাত-সংকর দ্রুতগতিযুক্ত যন্ত্রের জন্য, উড়োজাহাজের মোটর ইঞ্জিনের জন্য, কামানের নল এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়। মিসাইলের খোল তৈরীতেও এর প্রয়োজন হয়। এক্স-রে টিউবে, রেডিয়ো ভালবে এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক টিউবের জন্য মলিবডিনাম-সংকর দরকার হয়।

## টাইটেনিয়াম (Ti)

ইলমেনাইট নামে এক কালো রঙের বালুকায় একটি অজানা নতুন ধাতুর অক্সাইড রয়েছে যার প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন পাদ্রী উইলিয়াম গ্রেগর (১৭৯১)। এর স্বল্পকাল পরেই জার্মানীর ক্ল্যাপরথ রুটাইল খনিজেও সেই অক্সাইড রয়েছে প্রমাণ করেন। ধাতুটি নিষ্কাশিত না হলেও ১৭৯৫ সালে ক্ল্যাপরথ এর নাম দিয়েছিলেন "টাইটেনিয়াম"। পৃথিবীতে প্রথমে যে মানবজাতি আবির্ভূত হয়েছিলেন, গ্রীক পুরাণে তাঁদের বলা হত "টাইটান"। এই টাইটানেরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। সেই কথা স্মরণ করে এই শক্ত ধাতুটির ওই নাম দেওয়া হয়েছিল। অক্সাইড থেকে ধাতুটিকে উৎপাদন করার কৌশল জানা ছিল না বলে, দীর্ঘদিন এর প্রতি মানুষের তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না। এক শতাব্দীরও পরে ১৯১০ সালে হাণ্টার টাইটেনিয়াম ক্লোরাইডকে উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রায় সোডিয়ামের সাহায্যে বিজারিত করে বিশুদ্ধ টাইটেনিয়াম ধাতুটি নিষ্কাশন করতে সমর্থ হন।

বর্তমানে ও প্রায় সেই পদ্ধতিই চলেছে। তরল টাইটেনিয়াম ক্লোরাইডকে হিলিয়াম বা আর্গন গ্যাসের উপস্থিতিতে ম্যাগনেসিয়াম সহ উত্তপ্ত করলে স্পঞ্জের আকারে টাইটেনিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। তাকে গলিয়ে নিয়ে ধাতুটির ব্লক, পাত, তার ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। টাইটেনিয়াম কিন্তু ভূত্বকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নানারকম শিলায়, কাদামাটিতে, সাগরবেলার বালুকাতে, কয়লায়, লোহার আকরিকের সঙ্গে, এমনি নানাস্থানে টাইটেনিয়াম যৌগ বিধৃত হয়ে আছে। এমন কি জৈবজগতেও কিছু টাইটেনিয়ামের অস্তিত্ব রয়েছে। টাইটানিয়ামের পরিমাণ ভূত্বকের ০·৬২ শতাংশ। পরিমাণের বিচারে টাইটেনিয়ামের স্থান মৌলদের মধ্যে নবম। আর আমাদের ব্যবহার-যোগ্য ধাতুদের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশী হল অ্যালুমিনিয়াম, তারপর লোহা আর ম্যাগনেসিয়াম, চতুর্থ টাইটেনিয়াম। আকরিক হিসাবে দুইটি মাত্র খনিজ উল্লেখযোগ্য—ইলমেনাইট এবং রুটাইল। দু'টিতেই টাইটেনিয়াম অক্সাইডরূপে আছে। এই আকরিকগুলির অধিকাংশই নদীতটের বা সমুদ্রতীরের বালুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, ব্রাজিল, নরওয়ে, সুইডেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট টাইটেনিয়াম আকর আছে। আমাদের দেশেও ইলমেনাইট রয়েছে অপর্যাপ্ত। আমাদের কেরালার সমুদ্রতটের বালুর কালো ইলমেনাইট দুনিয়ার বাজারে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। কন্যাকুমারীর কাছে মানাবালা কুরুচিতে এবং কুইলনের চাভারাতে উৎকৃষ্ট ইলমেনাইট রয়েছে—

মোটামুটি হিসাবে এর পরিমাণ অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ কোটি টন। এই আকরিক-বালুর সঙ্গে কিছু মোনাজাইট আকরও থাকে—যাতে তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম রয়েছে। ১৯৫০ পর্যন্ত প্রতি বছর সবটা ইলমেনাইটই বিদেশে রপ্তানি হত। এখন অবশ্য যে ইলমেনাইট বালুতে ০·১% এর বেশী মোনাজাইট রয়েছে সেটাকে ভারত সরকারের পারমাণবিক বিভাগের নির্দেশে রপ্তানি করতে দেওয়া হয় না। কেরালা ছাড়াও অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যার সমুদ্র সৈকতেও ইলমেনাইট পাওয়া যায়।

যদিও এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই টাইটেনিয়াম ধাতুটির উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত হয়েছিল তবু ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ধাতুটির বিশেষ ব্যবহার হয় নি। তার কারণ ধাতুটিকে নিষ্কাশন করা যেমন দুষ্কর, তেমনি ব্যয়সাধ্য। টাইটেনিয়ামের গলনাঙ্ক ১৬৭০°C, কিন্তু অনেক কম উষ্ণতায়ই (প্রায় ৮০০°C) এটাতে আগুন ধরে যায় এবং ধাতুটি টাইটেনিয়াম অক্সাইড ও নাইট্রাইডে পরিণত হয়। সুতরাং লোহা বা তামার মত আকরিক থেকে বিগলন পদ্ধতিতে ধাতুটি পাওয়া সম্ভব নয়।

গত দেড়শ বছরে ধাতুটির অক্সাইড—অর্থাৎ টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড অবশ্য প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্বেতশুভ্র অক্সাইডটি একটি চমৎকার সাদা রঙ। জিঙ্ক অক্সাইড বা হোয়াইট লেড প্রভৃতি সাদা রঙের তুলনায় এর আবরণ-ক্ষমতা অনেক বেশী। তাছাড়া রঙটি স্থায়ী, নিষ্ক্রিয় এবং অক্ষতিকর, সেইজন্য এর সমাদর অধিক। কাগজ শিল্পে, রবার শিল্পে, প্রসাধন-দ্রব্য প্রভৃতিতে, কোন কোন প্লাস্টিকে, লিনোলিয়ামে, সেরামিক শিল্পে, এই অক্সাইডের চাহিদা যথেষ্ট।

১৯৪৭ সাল থেকে টাইটেনিয়ামের নানা আশ্চর্য গুণের জন্য উন্নত দেশগুলিতে ব্যয় সত্ত্বেও ধাতুটির উৎপাদন শুরু হয়। টাইটেনিয়াম অপেক্ষাকৃত হাল্কা। এর ঘনত্ব, ৪·৫১ গ্রাম/সিসি। সুতরাং এটি অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে একটু ভারী এবং লোহার চেয়ে অনেক হাল্কা। কিন্তু আশ্চর্য সম ওজনে টাইটেনিয়াম ইস্পাতের চেয়ে অধিক দৃঢ় এবং কঠোর। এজন্য যেখানে হাল্কা অথচ শক্ত ও ভারসহ যন্ত্রের প্রয়োজন, সেখানে টাইটেনিয়াম বা এর ইস্পাত-সংকর আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্রুতগতি উড়োজাহাজের কাঠামো ও ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈরী করতে অনেকক্ষেত্রেই ম্যাগনেসিয়ামের বদলে টাইটেনিয়াম ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। স্টীম টারবাইনের ব্লেডে, রেলের যন্ত্রাংশে, যুদ্ধাস্ত্রে, টাইটেনিয়ামের সংকর-ধাতুর প্রয়োজন বেড়েছে। ইস্পাত ছাড়াও ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে নানারকম সংকর-ধাতুতে টাইটেনিয়াম অংশ নেয়। অধিকন্তু

টাইটেনিয়ামের তাপসহতা খুব বেশী। উচ্চ তাপমাত্রাতেও এটা নমনীয় হয় না বা ক্ষয়ে যায় না। সেজন্য আজকাল জেট-ইঞ্জিন তৈরী করতে টাইটেনিয়াম ছাড়া চলে না।

সার্জনেরা আজকাল ভাঙা হাড় জোড়া দিতে কিংবা প্রতিস্থাপন করতে টাইটেনিয়াম ধাতুর নল বা দণ্ড ব্যবহার করেন। কারণ টাইটেনিয়ামের ঘনত্ব আর হাড়ের ঘনত্ব প্রায় সমান এবং টাইটেনিয়ামের অবক্ষয় নেই।

জলবায়ুতে ত নয়-ই, তীব্র-অ্যাসিড বা ক্ষারে, কিংবা লোনা জলেও টাইটেনিয়ামের কোন ক্ষতি হয় না বা মরচে পড়ে না। এই কারণে রাসায়নিক কারখানার পাত্র, নল ইত্যাদির জন্য টাইটেনিয়ামের ডাক পড়েছে। জাহাজের নিম্নাংশে টাইটেনিয়ামের আবরণ দিলে প্রচুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

বিদ্যুৎ-শিখায় টাইটেনিয়াম ধাতুকে গলিয়ে সাবধানে বাতাসের অনুপস্থিতিতে ঠাণ্ডা করলে এটা হীরকের মত উজ্জ্বল স্ফটিকাকারে পাওয়া যায়। কৃত্রিম উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে সেটি বিক্রী হয়।

# ৬

## মূল্যবান বিরল ধাতু

কয়েকটি ধাতু আছে, তাদের পরিমাণ বেশী নয় এবং সাধারণ প্রয়োজনেও লাগে না। কিন্তু অনেক সময় একটি বিশেষ কাজের জন্য এসব ধাতু অপরিহার্য। আবার কখনও এসব বিরল ধাতু স্বল্প পরিমাণে কোন সংকরধাতুর সঙ্গে মিশিয়ে তার একটি বিশেষ গুণ বাড়ানো যায়। তখন এগুলো খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে। সময় সময় বিশেষ গুণের জন্য এদের কোন কোন যৌগেরও যথেষ্ট কদর হয়।

এখানে এ রকম কয়েকটি ধাতুর বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

### অ্যান্টিমনি (Sb)

সুইডেন, বোর্নিও এবং অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন শিলার মধ্যে অ্যান্টিমনি ধাতু রয়েছে। অ্যান্টিমনির প্রধান আকর স্টিবনাইটের ($Sb_2S_3$) বেশীর ভাগ রয়েছে চীনে এবং কিছু কিছু মেক্সিকো, বলিভিয়া এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে। ভারতে কাংড়া জেলার লাহুল অঞ্চলে স্টিবনাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহারাষ্ট্রে ছোট একটি অ্যান্টিমনি উৎপাদনের কারখানা আছে। এখনও সেখানে বাইরে থেকে আমদানী করা আকরিক থেকে এই ধাতুটি তৈরী হচ্ছে।

এই রুপার মত চকচকে ধাতুটি ( গলনাঙ্ক ৬৩০°C, ঘনত্ব ৬·৬৭ ) সীসার সঙ্গে মিশালে সীসার শক্তি এবং দৃঢ়তা বেড়ে যায়। এই সংকর তরল থেকে কঠিনাকার হওয়ার সময় এর আয়তন সামান্য বৃদ্ধি পায়। এই কারণে সীসা-অ্যান্টিমনির সংকর প্রধানতঃ টাইপের ধাতুতে খুব প্রয়োজন হয়। এর সঙ্গে প্রায়ই একটু টিনও মিশিয়ে নেয়া হয়। অ্যান্টিমনিযুক্ত সীসা বুলেট, ব্যাটারীর প্লেট, বিদ্যুৎবাহী ক্যাবলের আবরকে সর্বদা ব্যবহার হয়। টিনের আলোচনায় ব্রিটানিয়া মেটাল, ব্যাবিট মেটাল প্রভৃতি অ্যান্টিমনিযুক্ত সংকর-ধাতুর কথা বলা হয়েছে। পয়টার সংকর-ধাতুতেও সময় সময় কিছু অ্যান্টিমনি মিশিয়ে দেওয়া হয়, উজ্জ্বলতা এবং দৃঢ়তা বাড়াবার জন্যে।

অ্যান্টিমনির দুইটি যৌগ ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হয় ; "টার্টার এমেটিক" এবং "ইউরিয়া স্টিবামাইন"। কলকাতার ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের অব্যর্থ প্রতিষেধক এই ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করেন।

## বেরিলিয়াম (Be)

বেরিলিয়াম ধাতুটি ধূসর শুভ্র, প্রায় ম্যাগনেসিয়ামের মত হাল্কা ( ঘনত্ব, ১'৮৪ ) কিন্তু বেশ শক্ত। এর গলনাঙ্ক, ১২৮০°C। ভূত্বকের ০'০০৬ শতাংশ বেরিলিয়াম।

ধাতুটির প্রধান আকর বেরিল ( beryl, 3BeO, $Al_2O_3$, $6SiO_2$ ) ব্রেজিল এবং আরজেনটিনাতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে বেরিল বিরাটাকারে থাকে। একবার প্রায় ২৫ টন ওজনের একটি বিশুদ্ধ স্ফটিকাকার বেরিল পাওয়া গিয়েছিল। সামান্য ক্রোমিয়াম অক্সাইড থাকার জন্য বেরিলের রঙ প্রায়ই নীলাভ-সবুজ। স্বচ্ছ বেরিল স্ফটিক, এমারেল্ড এবং নীলাভ অ্যাকোয়া-মেরিন মণি-পাথর হিসাবে খুব মূল্যবান। টোপাজ, ক্রাইসোবেরিল খনিজেও বেরিলিয়াম রয়েছে।

বেরিলিয়াম ধাতুটির প্রধান ব্যবহার তামা, নিকেল প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে তাদের কাঠিন্য বৃদ্ধি করায়। ২'২৫ শতাংশ বেরিলিয়াম মিশ্রিত তামার সংকর-ধাতুকে পান দিয়ে নিলে তামার তুলনায় ছয় গুণ এবং সাধারণ ইস্পাতের তুলনায় দ্বিগুণ শক্ত হয়। বেরিলিয়ামের ভিতর দিয়ে এক্স্-রে অনায়াসে চলাচল করতে পারে, তাই এক্স-রে যন্ত্রের জানালায় এটি ব্যবহার করা হয়। হাল্কা অথচ শক্ত এবং যথেষ্ট তাপসহনশীল বলে বেরিলিয়াম-যুক্ত ধাতু-সংকর আজকাল রকেটের যন্ত্রাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লীতে দ্রুত নিউট্রনের গতি সংযত করার জন্য বেরিলিয়ামের প্রয়োজন হয়। পারমাণবিক প্লুটোনিয়াম বোমার কেন্দ্রে বেরিলিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে।

## প্লাটিনাম (Pt)

এই ধাতুটিও খুবই বিরল এবং এত মহার্ঘ যে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ কাজে এর ব্যবহার হয় না। প্লাটিনামের সমধর্মী আরও পাঁচটি ধাতু আছে ঃ রুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম, অস্মিয়াম এবং ইরিডিয়াম। এই ছয়টি ধাতু একত্রে মৌলসমাজে 'প্লাটিনাম গোষ্ঠী' নামে পরিচিত। সবগুলিই প্রায় দুষ্প্রাপ্য এবং এদের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার প্রায় একই রকমের। এদের মধ্যে অবশ্য প্লাটিনামই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূত্বকে প্লাটিনামের পরিমাণ $১ \times ১০^{-৭}$ শতাংশ।

ইটালীর বিজ্ঞানী জুলিয়াস স্কালিজার ১৫৫৭ সালে প্রথম প্ল্যাটিনামকে

একটি নতুন ধাতু হিসাবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু প্রথম এই ধাতুটির প্রস্তুতি শুরু হয় আনুমানিক ১৭৫০ সালে। পৃথিবীতে প্রায় সবটা প্লাটিনাম পাওয়া যায় মৌলাবস্থায়। নদীর বালুতটে সোনার কণার মতই প্লাটিনাম কণা বালুকাতে মিশে থাকে। সেখান থেকেই সংগ্রহ করা হয়। রাশিয়াতে উরাল পাহাড়েও প্লাটিনাম রয়েছে অনেকটা। মাঝে মাঝে প্লাটিনামের ডেলাও হয়ত মেলে। ১৮৪৩ সালে রাশিয়াতে প্রায় দশ কিলোগ্রাম ওজনের একটি প্লাটিনাম-পিণ্ড পাওয়া গিয়েছিল। দুর্লভ একটি প্লাটিনাম আকরিক আছে, নাম স্পেরিলাইট ($PtAs_2$)। প্রকৃতিলব্ধ প্লাটিনামের সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই ইরিডিয়াম, অস্‌মিয়াম, রোডিয়াম প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত হয়ে সংকর অবস্থায় থাকে।

প্লাটিনামের সবচেয়ে বড় উৎস রাশিয়ার উরাল পাহাড়। দঃ আফ্রিকা, কালোম্বিয়া, কানাডা এবং আঃ যুক্তরাষ্ট্রেও অনেকটা প্লাটিনাম সংগৃহীত হয়। কখনও কখনও নিকেল খনিজের সঙ্গে বা সোনার উৎসের মধ্যে কিছু প্লাটিনাম পাওয়া যায়। ভারতে প্লাটিনাম নেই। কোলারের সোনা-ধোয়া জলে প্লাটিনামের সামান্য সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশের প্লাটিনাম উৎপাদনের গড় বার্ষিক পরিমাণ ঃ

| | রাশিয়া | দঃ আফ্রিকা | কানাডা | আঃ যুক্তরাষ্ট্র | কলোম্বিয়া |
|---|---|---|---|---|---|
| গড় পরিমান (আউন্স) | ১৭২৫০০০ | ৭৪২০০০ | ৪১০০০০ | ৩৬০০০ | ১৭০০০ |

প্লাটিনাম একটি আশ্চর্য ধাতু। ধাতুটির আগুনের শিখাতে কোনই পরিবর্তন হয় না, অ্যাসিড বা ক্ষারে কোন ক্ষতি হয় না। পিটিয়ে একে নানা আকার দেওয়া যায়। খুব সরু তার এবং অতি পাত্‌লা প্লাটিনামের পাত তৈরী করা যায়। সমস্ত মৌলের মধ্যে অস্‌মিয়াম সবচেয়ে ভারী এবং তারপরেই প্লাটিনাম, ঘনত্ব ২১·৪ গ্রাম/ সিসি।

প্লাটিনামের এবং কাচের প্রসারাঙ্ক প্রায় একই, সেজন্য কাচের সঙ্গে এই ধাতুটির তার বা পাত সহজেই জোড়া যায়। ল্যাবরেটরীর অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্র-পাতিতে, বৈদ্যুতিক সেলের ইলেকট্রোড হিসাবে, থার্মকাপলে, মূল্যবান জড়োয়া গয়না তৈরীতে প্লাটিনামের যথেষ্ট চাহিদা। দুই একটি রাসায়নিক শিল্পে প্লাটিনাম প্রভাবকরূপে (catalyst) ব্যবহৃত হয়। যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে। প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের সংকর ধাতু কলমের মাথায় বসান হয়।

## পারদ (Hg)

পারদের ইংরাজী নাম মারকারি আর রাসায়নিক নাম Hydrargyrum। এইটিই একমাত্র ধাতু যা সাধারণ তাপমাত্রাতে তরলাকারে থাকে। পারদ জলের

চেয়ে সাড়ে তের গুণ ভারী। যে পাত্রে থাকে তাকে সিক্ত করে না। এর প্রসারাঙ্কও যথেষ্ট। এই সকল কারণে পারদ তাপ এবং চাপ পরিমাপনে থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটারে সর্বদা ব্যবহার করা হয়। পারদ-বাষ্পের আর্ক-ল্যাম্প আলোর জন্য যথেষ্ট ব্যবহৃত। সোনা, রুপা, টিন, দস্তা প্রভৃতি প্রায় সব ধাতুই পারদে দ্রবীভূত হয়ে পারদ সংকর তৈরী করে। প্লাটিনাম পারদে দ্রবিত হয় না। সোনা ও রুপার পারদ সংকর দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। কস্টিক সোডা প্রস্তুতির শিল্প পদ্ধতিতে পারদ-ইলেকট্রোড প্রয়োজন হয়।

পারদ-যৌগেরও কিছু ব্যবহার আছে। স্বর্ণ-সিন্দুর (HgS) ঔষধ হিসাবে কবিরাজেরা যথেষ্ট ব্যবহার করেন। ক্যালোমেল বা মারকিউরাস ক্লোরাইডও ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। টমেটো, আলু, গম ইত্যাদিকে ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ক্ষেতে পারদের যৌগ প্রয়োগ করা হয়।

খ্রীষ্টজন্মের অন্তত দেড় হাজার বছর পূর্বেও চীন ও ভারতে পারদ ব্যবহৃত হয়েছে। পারদের একটিই মাত্র আকরিক, নাম সিনাবার (HgS)। স্পেনে রয়েছে এই আকরিকের প্রধান ভাণ্ডার। চীন, ইটালী ও রাশিয়াতেও সিনাবার রয়েছে। ভারতে এর কোন আকর নেই।

## বিসমাথ (Bi)

এই ধাতুটির আকর বিসমুথায়ানাইট বলিভিয়াতে পাওয়া যায়। সীসা, রুপা প্রভৃতি ধাতু উৎপাদনের পরে যে গাদ থাকে সেখান থেকে প্রায়ই বিসমাথ উদ্ধার করা হয়। এভাবেই ভারতে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীনে ধাতুটি সংগ্রহ করা হয়। ভারতে কোন বিসমাথ আকরিক নেই।

বিসমাথ সামান্য লালচে আভাযুক্ত সাদা ধাতু, খুব ভারী ( ঘনত্ব, ৯.৮ ) এবং গলনাঙ্ক ২৭১°C, সীসা, টিন প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে এর কয়েকটি সংকর-ধাতু তৈরী করা হয়, যেগুলি অল্প তাপমাত্রাতেই গলে যায়।

| সংকর ধাতু | গলনাঙ্ক(°C) | উপাদান Bi : Pb : Sn : Cd |
|---|---|---|
| উড্‌মেটাল | ৭১°C | ৪ : ২ : ১ : ১ |
| রোজ মেটাল | ৯৩.৮°C | ২ : ১ : ১ : ০ |

যে জায়গায় সহসা আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে শীতল জলের পাইপ রাখা হয়। সেই পাইপের মাঝে মাঝে ছিপি থাকে এবং সেগুলো এইরকম ধাতুসংকর দিয়ে জুড়ে দেওয়া থাকে। হঠাৎ আগুন লাগলে যেই

তাপমাত্রা বাড়ে, জোড়ার মুখ আপনা থেকেই গলে খুলে যায় এবং ঠান্ডা জলস্রোতে আগুন নিভে যায়। স্বয়ংক্রিয় অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র! বয়লারের ছিপিতেও এরকম উপযুক্ত সংকর-ধাতু ব্যবহৃত হয়। পারাসেলসাস সে যুগে বিসমাথের যৌগ ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন। বিসমাথ সাব-নাইট্রেট এখনও পেটের রোগে ব্যবহার হয়।

## ক্যাডমিয়াম (Cd)

ক্যাডমিয়াম একটি বিরল অথচ প্রয়োজনীয় ধাতু। ভূপৃষ্ঠে এর পরিমাণ ভূত্বকের ০·০০০০৫ শতাংশ মাত্র। কমলা-হলুদ রঙের খনিজ গ্রিনোকাইট (CdS) ক্যাডমিয়ামের একমাত্র আকরিক। তবে দস্তার খনিজের মধ্যে সর্বদাই কিছু ক্যাডমিয়াম মিশ্রিত থাকে। দস্তা-উৎপাদনের সময় ক্যাডমিয়ামও পৃথক করে সংগ্রহ করা হয়। আমাদের রাজস্থানে যে দস্তা তৈরী হয় তাতে প্রায় ০·২৩ শতাংশ ক্যাডমিয়াম রয়েছে। সেখানে থেকেই বছরে আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যাডমিয়ামের অধিকাংশ পাওয়া যায়; বছরে গড়ে ৫০～৬০ টন এই ধাতু উদ্ধার করা হয়।

ক্যাডমিয়াম উজ্জ্বল সাদা ধাতু, গলনাঙ্ক ৩২০·৯°C। ক্যাডমিয়াম একাধিক প্রয়োজনে লাগে: (১) লোহা, ইস্পাত, তামা ইত্যাদির তৈরী জিনিসের উপরে ক্যাডমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয় ক্ষয় রোধের জন্য এবং সৌন্দর্যের জন্য। তড়িৎ-লেপনে ক্যাডমিয়ামের একটি পাতলা কিন্তু দৃঢ় আস্তর পড়ে। (২) বিদ্যুৎ-পরিবহনের তামার তারে ০·৯% ক্যাডমিয়াম মেশান থাকে। ক্যাডমিয়ামের মিশ্রণে তড়িৎ-পরিবাহিতা সামান্য কমে, কিন্তু তার অনেক শক্ত হয়। (৩) ক্যাডমিয়াম-নিকেল সংকর ধাতু শক্তিশালী ইঞ্জিন তৈরীতে প্রয়োজন হয়। (৪) বিখণ্ডনকে সংযত করার জন্য পারমাণবিক চুল্লীতে ক্যাডমিয়াম দণ্ড ব্যবহার হয়। (৫) কোন কোন সেলে এবং ব্যাটারী-প্লেটে ক্যাডমিয়ামের ইলেকট্রোড থাকে।

## জারকোনিয়াম (Zr)

জারকোনিয়াম ধাতুটির আকরিক হল ব্যাডিলাইট ($ZrO_2$) এবং জারকন ($ZrSiO_4$)। সিংহল ও ব্রেজিলে ব্যাডিলাইট পাওয়া যায় আর সিংহল, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েসিয়া, উরালে রয়েছে জারকন। ভূত্বকে জারকোনিয়াম বেশী

নেই, আনুমানিক ০·০২২ শতাংশ। আমাদের কেরালার সাগরবেলাতে যে কালো ইলমেনাইট বালু রয়েছে তাতে প্রায় ৫ শতাংশ জারকন আছে। এক সময়ে এই জারকন ইলমেনাইট থেকে আলাদা করে বিদেশে চালান যেত। বিদেশে জরেকন থেকে জারকন-ডাইঅক্সাইড ($ZrO_2$) তৈরী হয়। এই অক্সাইড খুব উঁচু উষ্ণতায়ও গলে না। সেইজন্য ধাতু গলাবার জন্য মুচি তৈরী করতে জারকন-ডাই অক্সাইড ব্যবহার হত। জারকনের পালিশ-করা একটু বড় টুকরো মানিক বলে গণ্য হয়। জারকোনিয়াম অক্সাইডের প্রথম সন্ধান পান ক্ল্যাপরথ (১৭৮৯)। এরও পরে বার্জেলিয়াস ১৮০৮ সালে খানিকটা অবিশুদ্ধ ধাতু তৈরী করতে পেরেছিলেন। জারকোনিয়ামের সঙ্গে সর্বদাই এর সমধর্মী এবং সমগোত্রীয় হ্যাফনিয়াম মিশ্রিত থাকে এবং এদের পৃথক করা খুব কষ্টসাধ্য। বাজারে যে জারকোনিয়াম পাওয়া যায় সেটা সর্বদাই হ্যাফনিয়াম মিশ্রিত।

জারকোনিয়াম সাদা ধূসর রঙের ধাতু; গলনাঙ্ক উঁচু, প্রায় ১৮০০°C। এই ধাতুটি অ্যাসিড বা ক্ষারে ক্ষয় হয় না। বিশুদ্ধ জারকোনিয়ামের ভিতর দিয়ে নিউট্রন অনায়াসে চলাচল করতে পারে। বাজারের সাধারণ জারকোনিয়ামের ভিতর দিয়ে নিউট্রন যেতে পারে না, হ্যাফনিয়াম থাকার জন্য। ঐ সকল গুণের জন্য জারকোনিয়াম আজকাল পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহার হচ্ছে। এই চুল্লীর ইউরেনিয়াম দণ্ডগুলি ধাতব খাপের মধ্যে ভরে দিতে হয়। কিছুদিন পরে যখন ইউরেনিয়াম দন্ড পরিবর্তন করতে হয় তখন দণ্ডগুলিকে অ্যাসিডে গুলে সরিয়ে ফেলে খাপের মধ্যে নতুন ইউরেনিয়াম নিতে হয়। খাপটি এমন হতে হবে যাতে নিউট্রন সহজে বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া খোলটি তাপসহ হতে হবে এবং অ্যাসিডে বা রাসায়নিক দ্রাবকে অক্ষত থাকতে হবে। হ্যাফনিয়াম মুক্ত জারকোনিয়ামের ঐ সকল গুণ আছে তাই ইউরেনিয়াম দণ্ডগুলির খোল বিশুদ্ধ জারকোনিয়ামের পাত দিয়ে তৈরী করা হয়।

ফটো-ফ্লাস বাল্‌বে, রেডিয়ো-ভালভ টিউবেও জারকোনিয়াম প্রয়োজন হয়।

## সেলেনিয়াম (Se) ও টেলুরিয়াম (Te):

এই দুইটি মৌল খুবই বিরল, পৃথিবীতে এদের পরিমাণ ভূত্বকের ০·০০০০০০১ শতাংশেরও কম। টেলুরিয়াম ও সেলেনিয়ামের আচার আচরণে মিল যথেষ্ট এবং প্রকৃতিতে অনেক সময়েই তাদের একত্র পাওয়া যায়। রুমানিয়ার মুলার ফন রাইখেনস্টিন ১৭৮২ সালে শিলা থেকে টেলুরিয়াম আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর শিলা থেকে পাওয়া সেজন্য ক্ল্যাপরথ এর নাম দেন টেলুরিয়াম, গ্রীক

শব্দ টেলাস্‌ অর্থ পৃথিবী। এরপর সমধর্মী এবং সমগোত্রীয় সেলেনিয়াম ধাতুটিকে আবিষ্কার করেন সুইডেনের বার্জেলিয়াস। টেলুরিয়ামের সঙ্গী বলে এর নাম দেন সেলেনিয়াম, গ্রীক শব্দ 'সেলেন' অর্থ চাঁদ। কেন না চাঁদও পৃথিবীর সঙ্গেই থাকে। মৌলাবস্থায় এই দুইটি ধাতুকে পাওয়া যায়। তাছাড়া, এদের কিছু কিছু যৌগ-আকরিক ও রয়েছে। যেমন, টেলুরিয়ামের আকর সিলভ্যানাইট $(Ag, Au)Te_2$, টেট্রাডিমাইট $(Bi_2Te_3)$। সেলেনিয়ামের প্রধান আকরিক হল জরগাইট $(Cu_2Se)$, ক্রুকসাইট $(Cu, Tl, Ag)_2Se$ ইত্যাদি। সীসা, তামা ও রূপা এই ধাতুগুলিকে আকর থেকে উৎপাদন করে আবার তড়িৎ-পদ্ধতিতে শোধন করা হয়। শোধনের সময় বিশুদ্ধ ধাতু ক্যাথোডে জমা হয় এবং অ্যানোডে আবর্জনার গাদ জমে। এই গাদ থেকে সেলেনিয়াম এবং টেলুরিয়াম সর্বদা উদ্ধার করা হয়।

টেলুরিয়ামের উল্লেখযোগ্য তেমন কোন প্রয়োগ নেই। কিন্তু সেলেনিয়ামের একটি বিশেষ গুণ আছে যার জন্য তার যথেষ্ট কদর। সেলেনিয়ামের তড়িৎ-বাহিতা প্রায় নেই। কিন্তু আলোর রশ্মি সেলেনিয়ামের উপরে পড়লে তার যথেষ্ট তড়িৎ-পরিবাহিতা দেখা দেয়। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোতে এই তড়িৎ-পরিবাহিতার মাত্রা বিভিন্ন হয়। এই গুণের জন্য আলোক-বিদ্যুৎ (photo electric) সেলে সেলেনিয়াম সর্বদা ব্যবহৃত হয়। সেলেনিয়াম সেমি-কন্ডাক্টার তাই টেলিভিশন ক্যামেরাতে এবং সৌর ব্যাটারীতে ব্যবহৃত হয়। সেলেনিয়াম ও টেলুরিয়ামের কিছু যৌগ রঙীন কাচ ও পর্সেলীনের জন্য প্রয়োজন হয়।

* * *

যে সকল ধাতু এবং ধাতুসংকর বিভিন্ন শিল্পে, যানবাহনে, প্রতিরক্ষায় এবং আমাদের জীবনযাত্রার দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে তাদের কথাই এ পর্যন্ত বলা হল। আবার দেখা গেল কয়েকটি ধাতু যেমন, অ্যান্টিমনি, ক্যাড্‌মিয়াম, বেরিলিয়াম, প্রভৃতি, অপেক্ষাকৃত বিরল হলেও বিশেষ বিশেষ কাজে প্রয়োজন হয়। আরও কিছু ধাতু রয়েছে যেগুলো পৃথিবীতে অনেকটাই আছে কিন্তু ধাতু বা ধাতবসংকর হিসাবে তাদের বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। পক্ষান্তরে তাদের যৌগগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের জীবনযাত্রায় অপরিহার্য। উদাহরণ হিসাবে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোন কোন পারমাণবিক চুল্লীতে গলিত সোডিয়াম ধাতু তাপবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর যৌগগুলি প্রচুর প্রয়োজন ; যেমন, সোডিয়াম ক্লোরাইড ( খাদ্য লবণ হিসাবে ), সোডিয়াম কার্বনেট ( সোডা এবং কাঁচ শিল্পে ), সোডিয়াম সালফেট ( ঔষধ হিসাবে ), সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ( সাবান শিল্পে ),

সোডিয়াম বোরেট ( সোহাগা ) ইত্যাদি। পটাসিয়াম লবণ জমির সার হিসাবে খুবই প্রয়োজন। ক্যালসিয়াম ধাতুর ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই কিন্তু এর অনেক যৌগের বিস্তর চাহিদা। যেমন, চুন, মার্বেলপাথর, চক, ব্লীচিং পাউডার, প্লাস্টার অফ্ প্যারিস ইত্যাদি।

এগুলো ছাড়া আরও অনেকগুলো ধাতু রয়েছে যেগুলো পৃথিবীতে অতি সামান্যই পাওয়া যায় এবং তাদের ব্যবহারিক কোন প্রয়োগ নেই যেমন, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, বেরিয়াম, স্ক্যাণ্ডিয়াম, ইটারবিয়াম, নাইয়োবিয়াম, হ্যাফনিয়াম, ট্যাণ্টালাম, গ্যালিয়াম, ইণ্ডিয়াম, থেলিয়াম, জারমেনিয়াম, ১৪টি বিরলমৃত্তিক ল্যান্থ্যানাইড গোষ্ঠির সমধর্মী ধাতু, সিরিয়াম, প্রেসিওডিমিয়াম ইত্যাদি। এদের আলোচনা ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণাতেই সীমাবন্ধ। তাই এদের বিষয়ে এখানে আর বিশেষ করে বলা হল না।

৭

# তেজস্ক্রিয় ধাতু

পরমাণুর গঠন-শৈলীর বিষয় আজকাল সবাই জানে। যে কোন মৌলের পরমাণুই তিনরকম আদি কণা—প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন—দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন মৌলের পরমাণুতে এই আদি কণাগুলোর সংখ্যা অবশ্যই বিভিন্ন।

পরমাণুর সবগুলি প্রোটন এবং নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে আর ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন ব্যাসের চক্রাকার পথে কেন্দ্রের চারদিকে সর্বদা অতি দ্রুত বেগে ঘুরতে থাকে। কেন্দ্রে কোন ইলেকট্রন থাকে না।

প্রোটন-কণা পরাধর্মী, এতে এক একক পজিটিভ বিদ্যুৎ রয়েছে। ইলেকট্রন-কণা অপরাধর্মী, এতে এক একক নেগেটিভ বিদ্যুৎ থাকে। নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ, তার কোন বিদ্যুৎ-আধান নেই। প্রত্যেক পরমাণুর প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান। সুতরাং পরমাণুর নীট কোন বিদ্যুৎ-মাত্রা নেই।

প্রোটন-কণা এবং নিউট্রন-কণার ওজন প্রায় সমান। সেই তুলনায় একটি ইলেকট্রনের ওজন এত কম যে ধর্তব্যই নয়। যেহেতু ইলেকট্রনের ওজন নগণ্য, অতএব একটি পরমাণুর ভর তার কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রন কণাগুলোর ভরের সমান। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন আছে। অতএব হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর মোটামুটি একটি প্রোটন অথবা একটি নিউট্রনের ভরের সমান।

অতি ক্ষুদ্র বলে পরমাণুর ভর গ্রামে দেওয়া হয় না। পরমাণুর ভর প্রকাশ করার জন্য একটি নূতন একক ব্যবহৃত হয়। একটি কার্বন ($^{12}C$) পরমাণুর ১/১২-অংশ (এক দ্বাদশাংশ) হচ্ছে এই একক। এই-ই পারমাণবিক ভরের একক, atomic mass unit বা amu।

∴ পারমাণবিক ভরের একক ≡ একটি প্রোটন বা একটি নিউট্রনের ভর।

একটি কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন এবং ৬টি নিউট্রন আছে। এদের সমবেত ভর ১২টি প্রোটন বা ১২টি নিউট্রনের ভরের সমান।

সুতরাং কোন পরমাণুর কেন্দ্রে যতগুলি মোট প্রোটন ও নিউট্রন থাকে, সেই পরমাণুর ভর তত একক। যেমন, একটি সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে ১১টি প্রোটন এবং ১২টি নিউট্রন আছে। সুতরাং উহার ভর, ২৩।

গ্রামের হিসাবে,

১ amu = $\frac{1}{12}$ কার্বন পরমাণুর ভর ≡ ১·৬৬ × ১০^-২৪ গ্রাম।

যে সব মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রে অনেক বেশী সংখ্যক নিউট্রন আর প্রোটন থাকে সে সব পরমাণু অস্থায়ী হয় এবং আপনা থেকেই ভেঙে ভেঙে যায়। দেখা গেছে, কোন মৌলের পরমাণু যদি সীসার পরমাণুর চেয়েও গুরুভার হয়, তবে তার কেন্দ্রে অস্থিরতা দেখা দেয়। এইসব স্বতঃভঙ্গুর পরমাণুর কেন্দ্র থেকে অবিরত অদৃশ্য আল্‌ফা কণার রশ্মি ($\alpha$-rays) অথবা বীটা-কণার রশ্মি ($\beta$-rays) বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কোন মৌলের পরমাণু থেকে $\alpha$-কণা আর কোন মৌলের পরমাণু থেকে $\beta$-কণা বেরিয়ে আসবে সেটা নির্দিষ্ট। যেমন, রেডিয়াম থেকে সর্বদাই $\alpha$-কণা আর অ্যাক্টিনিয়াম ধাতু থেকে সর্বদাই $\beta$-কণা উৎসারিত হয়। এই রশ্মি-বিকিরণ সর্বাবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে থাকে এবং কোন ভাবেই এটা বন্ধ করা যায় না। পরমাণু-কেন্দ্র থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মি-বিকিরণই "তেজস্ক্রিয়তা", আর যে সমস্ত মৌল থেকে এই বিকিরণ ঘটে তাদের বলা হয় "স্বভাব তেজস্ক্রিয়" মৌল। (বর্তমানে কৃত্রিম উপায়েও স্থায়ী মৌলকে তেজস্ক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে।)

এই রশ্মির কণাগুলোর বিদ্যুৎ-আধান রয়েছে। প্রতিটি $\alpha$-কণাতে দুইটি নিউট্রন ও দুইটি প্রোটন আছে। প্রোটন থাকার জন্য এর বিদ্যুৎ-ভার পরাধর্মী বা পজিটিভ। $\beta$-কণাগুলো বস্তুতঃ ইলেকট্রন কণা সুতরাং তার বিদ্যুৎভার অপরাধর্মী বা নেগেটিভ। এই কণা-রশ্মির সঙ্গে কিছু শক্তিশালী তরঙ্গ-রশ্মিও উৎসারিত হয়—তাদের বলা হয় গামা-রশ্মি ($\gamma$-rays)। এদের অবশ্য কোন তড়িতাধান নেই।

কোন মৌলের পরমাণু কেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যাকে বলা হয় সেই মৌলের ক্রমাঙ্ক। যেমন, কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটন আছে, তাই কার্বনের ক্রমাঙ্ক ৬। সীসার পরমাণু-কেন্দ্রে ৮২-টি প্রোটন রয়েছে বলে তার ক্রমাঙ্ক ৮২। প্রত্যেকটি মৌলের ক্রমাঙ্ক নির্দিষ্ট। ক্রমাঙ্কই মৌলের ধ্রুব পরিচয়। বিভিন্ন উৎস থেকে এলেও দুইটি পরমাণুর ক্রমাঙ্ক যদি একই হয় তবে তারা একই মৌলের হবে।

পরমানু-চিহ্নের মাথায় পারমাণবিক ভর লেখা হয় আর চিহ্নের নীচে তার ক্রমাঙ্ক লেখা হয়; যথা,

$$^{12}_{6}C, \quad ^{23}_{11}Na, \quad ^{208}_{82}Pb, \quad ^{238}_{92}U$$

একটি মৌলের, স্থায়ী বা তেজস্ক্রিয়, সবগুলো পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা

অর্থাৎ একই হতে হবে। অর্থাৎ, দুইটি পরমাণুর ক্রমাঙ্ক এক হলে তাদের একই মৌলের পরমাণু বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু কোন মৌলের সবগুলো পরমাণুর ভর এক না-ও হতে পারে। বস্তুতঃ প্রায় প্রত্যেক মৌলেরই নানা ওজনের পরমাণু রয়েছে। একই মৌলের বিভিন্ন ওজনের পরমাণুগুলোকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। যেমন,

$$^{12}_{6}C,\quad ^{14}_{6}C;\quad ^{208}_{82}Pb,\quad ^{206}_{82}Pb;\quad ^{238}_{92}U,\quad ^{235}_{92}U;$$ ইত্যাদি।

আইসোটোপগুলির ভর বা ওজন আলাদা কিন্তু স্বভাবে ও রাসায়নিক ধর্মে তারা সম্পূর্ণ অভিন্ন।

যখন কোন মৌলের পরমাণু কেন্দ্র থেকে একটি $\alpha$-কণা বা $\beta$-কণা বেরিয়ে যায় তখন কেন্দ্রের প্রোটন-সংখ্যা তথা ক্রমাঙ্ক বদলে যায়। এইজন্য সেই পরমাণুটির আর সেই মৌলত্ব থাকে না ; নতুন একটি মৌলের পরমাণুতে পরিণত হয়। হঠাৎ এক মৌল থেকে অপর একটি মৌল জন্ম নেয়। এই নূতন পরমাণুটির কেন্দ্রও যদি গুরুভার হয় তবে এটিও ভেঙে গিয়ে আর একটি নতুন মৌলের সৃষ্টি করবে। এমনি পরপর ভাঙন চলতে থাকবে যতক্ষণ না কেন্দ্রটি স্থায়িত্ব লাভ করে। রশ্মিকণা বেরিয়ে যেতে যেতে একসময়ে কেন্দ্রটি সীসার পরমাণুর সমপর্যায়ে আসে। অর্থাৎ প্রোটন-সংখ্যা সীসার সমান (৮২) হয়। তখন পরমাণুটি স্থায়িত্ব লাভ করে, পরমাণুর ভাঙন বন্ধ হয়। সীসা তো তেজস্ক্রিয় মৌল নয়।

একটি $\alpha$-কণা বেরিয়ে গেলে কেন্দ্রের দুইটি প্রোটন কমে যায়, অতএব ক্রমাঙ্ক দুই হ্রাস পায়। ভর চার একক হ্রাস পায়। আবার একটি $\beta$-কণা উৎসারিত হয়ে গেলে, একটি নেগেটিভ আধান কমে তথা একটি পজিটিভ আধান কেন্দ্রে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং $\beta$-কণার উৎসারণে ক্রমাঙ্ক 'এক' বৃদ্ধি পায়। ওজনের কোন তারতম্য হয় না, কারণ $\beta$-কণার ভর নগণ্য। পরপর যদি একটি $\alpha$-কণা ও দুইটি $\beta$-কণা বেরিয়ে যায় তবে ক্রমাঙ্ক পুনরায় আগের সমান হবে ; কিন্তু ওজন হ্রাস পাবে। সুতরাং আইসোটোপের সৃষ্টি হবে।

পরপর তেজস্ক্রিয় মৌল সৃষ্টির একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। কখন $\alpha$-কণা আর কখন $\beta$-কণা বিচ্ছুরিত হয় সেটা উপরের তীর চিহ্নে নির্দেশ করা হয়েছে।

$$^{238}_{92}U_I \xrightarrow{\alpha} {}^{234}_{90}Ux_1 \xrightarrow{\beta} {}^{234}_{91}Ux_2 \xrightarrow{\beta} {}^{234}_{92}U_{II} \xrightarrow{\alpha} {}^{230}_{90}Io \xrightarrow{\alpha} {}^{226}_{88}Ra$$
$$\xrightarrow{\alpha} {}^{222}_{86}Rn \xrightarrow{\alpha} {}^{218}_{84}RaA \xrightarrow{\alpha} {}^{214}_{82}RaB \xrightarrow{\beta} {}^{214}_{83}RaC \xrightarrow{\beta} {}^{214}_{84}RaC$$
$$\xrightarrow{\alpha} {}^{210}_{82}RaD \xrightarrow{\beta} {}^{210}_{83}RaE \xrightarrow{\beta} {}^{210}_{84}RaF \xrightarrow{\alpha} {}^{206}_{82}RaG$$ ( সীসা )।

ইউরেনিয়াম ($U_I$) প্রকৃতিলব্ধ তেজস্ক্রিয় মৌল-এর পরমাণু কেন্দ্রে আছে ৯২টি প্রোটন আর ১৪৬টি নিউট্রন। এর কেন্দ্র থেকে একটি $\alpha$-কণা বেরিয়ে গেলে মৌল তৈরী $U_{XI}$ হয় এবং এটা থেকেও একটি $\beta$-কণা উৎসারিত হয়; $U_{XII}$-এর সৃষ্টি হয়। $U_{XII}$ থেকেও একটি $\beta$-কণা চলে যায় এবং $U_{II}$ মৌল উৎপন্ন হয়। $U_{II}$-মৌল থেকে $\alpha$-কণা উৎসারণে আয়োনিয়াম (Io) মৌল হয়। এগুলো সবই তেজস্ক্রিয়। Io একটি $\alpha$-কণা হারিয়ে রেডিয়ামে (Ra) পরিণত হয়। রেডিয়াম উৎপত্তির এই ইতিহাস। রেডিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত $\alpha$-কণা বিকিরণের ফলে র‍্যাডন গ্যাস (Rn) হয়। এমনি করে একের পর এক নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলের সৃষ্টি ও লয় হতে হতে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী সীসাতে পরিণত হয়। তখন তেজস্ক্রিয়তা লোপ পায়।

অর্থাৎ অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষে ইউরেনিয়াম সীসাতে পরিণতি লাভ করে। একে বলা হয় ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় শ্রেণী। স্পষ্টতঃই $U_I$ এবং $U_{II}$-এর ক্রমাঙ্ক একই (৯২), সুতরাং এরা আইসোটোপ। আবার RaB, RaD এবং RaG-এরা আইসোটোপ এবং সীসার সমধর্মী। এরকম থোরিয়াম ও অ্যাকটিনিয়াম থেকে উদ্ভূত আরও স্বভাব-তেজস্ক্রিয় মৌলের শ্রেণী রয়েছে।

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পলোনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি অনেক তেজস্ক্রিয় ধাতু পৃথিবীতে রয়েছে। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামকেই প্রধানতঃ পৃথিবীর আদি তেজস্ক্রিয় মৌলরূপে গণ্য করা হয়। এদের ভাঙনের ফলেই প্রকৃতিতে অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌলের উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবীতে এদের পরিমাণ সামান্য হলেও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য এদের গুরুত্ব এখন খুবই বেশী। এই প্রধান দুইটি তেজস্ক্রিয় ধাতুর কথাই এখানে বলা হয়েছে।

## ইউরেনিয়াম (U) :

১৭৮৯ সালে ক্ল্যাপরথ অস্ট্রিয়া থেকে পাওয়া একটি ভারী কালো খনিজ পিচব্লেন্ড বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি অজ্ঞাত নতুন ধাতুর অক্সাইডের সন্ধান

পান। তিনি অবশ্য মূল ধাতুটিকে তৈরী করতে পারেন নি। এর আট বছর আগে (১৭৮১) একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়, তার নাম দেওয়া হয়েছিল, ইউরেনাস। সেটা অনুসরণ করে ক্ল্যাপরথ এই নতুন ধাতুটির নামকরণ করেন ইউরেনিয়াম। মূল ধাতুটি আবিষ্কার করার কৃতিত্ব ফরাসী রসায়নবিৎ পেলিগোর (১৮৪১)। প্রথমে ইউরেনিয়াম ক্লোরাইড তৈরী করে, তারপর সেটিকে সোডিয়ামের সাহায্যে বিজারিত করে তিনি ধাতুটি উৎপাদন করেন।

ইউরেনিয়ামের প্রধান আকরিক হল, পিচ্‌ব্লেন্ড ($U_3O_8$) এবং কার্নোটাইট (ইউরেনিয়াম ভ্যানেডেট)। যদিও আরও বহু খনিজ পাথরে অল্পাধিক ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পারমাণবিক যুগে এখন এক-সহস্রাংশেরও কম পরিমাণ ইউরেনিয়াম যদি কোনও খনিজে থাকে তবে সেটাও মূল্যবান উৎস বলে ধরা হয়। পিচব্লেন্ড প্রধানতঃ পাওয়া যায় কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কঙ্গো, ককেসাস, বোহেমিয়া প্রভৃতি দেশে। কার্নোটাইট প্রধানতঃ রয়েছে আমেরিকার কলোরাডোতে। ভারতে সামারস্কাইট খনিজে সামান্য রয়েছে আর কেরালার মোনাজাইট বালুতে রয়েছে ০˙৫% ইউরেনিয়াম অক্সাইড। বিহারের সিংভূম জেলায় যেখানে তাম্রখনি রয়েছে তার কাছাকাছি জায়গায় কিন্তু ইউরেনিয়ামের খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্য পরিমাণ বেশী নয়; ০˙৬%। রাজস্থানেও পেগমাটাইট পাথরে কিছু ইউরেনিয়াম রয়েছে। সবদেশেই এখন ইউরেনিয়াম থোরিয়ামের সমস্ত খনিজ সরকারী নিয়ন্ত্রণে। একটা আনুমানিক হিসাবে দেখা গেছে এখন পৃথিবীতে মাত্র ৫৫ লক্ষ টন ইউরেনিয়াম খনিজ আছে। কোন দেশে কতটা ইউরেনিরাম তৈরী হচ্ছে সেটা জানা সম্ভব নয়। ১৯৬৮তে দেখা গেছে আমেরিকা ও অন্যান্য অকমিউনিস্ট দেশগুলোতে ২২ হাজার টন ইউরেনিয়াম অক্সাইড সংগৃহীত হয়েছিল। এর সমপরিমাণ সংগ্রহ কমিউনিস্ট দেশগুলোতেও হয়েছিল ধরে নেওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়াতে ইউরেনিয়ামের এক বিরাট ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়াই সর্বাধিক পরিমাণ ইউরেনিয়ামের যোগান দেবে মনে হয়।

ইউরেনিয়াম অক্সাইডের উৎপাদন (১৯৬৮)

| আঃ যুক্তরাষ্ট্র | আফ্রিকা | কানাডা | ফ্রান্স | গ্যাবন |
|---|---|---|---|---|
| ১২৩৪০ | ৩৮৭০ | ৩৭০০ | ১৪৫০ | ৫৩০( টন ) |

ইউরেনিয়াম একটি চকচকে সাদা ভারী ধাতু (ঘনত্ব ১৮˙৭)। এর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্ম হল এর স্বতঃস্ফূর্ত রশ্মি বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তা। তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ই ত হয়েছিল ইউরেনিয়ামের মাধ্যমে। ১৮৯৬

সালে ফরাসী বিজ্ঞানী বেকরেল দেখতে পেলেন, ইউরেনিয়ামযুক্ত কোন পদার্থ কাছে থাকলে সেটা থেকে এক অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে এসে কাগজের মোড়ক বা বাক্স ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফির প্লেটে কালো দাগ ফেলে। যে কোন অবস্থায় যে কোন ইউরেনিয়াম যৌগ থেকে একই হারে বিকিরণ হতে থাকে। বেকরেল এই অভূতপূর্ব ঘটনার নাম দেন রেডিয়ো-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা। কিছু পরেই দেখা গেল যে, বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম যৌগ থেকে যে রশ্মি বিকীর্ণ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী জোরালো রশ্মি নির্গত হয় পিচব্লেন্ড আকরিক থেকে যেখানে ইউরেনিয়ামের শতকরা ভাগ অনেক কম। নিঃসন্দেহে পিচব্লেন্ডে ইউরেনিয়াম ছাড়াও আরও শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় মৌল রয়েছে। ম্যাডাম কুরী এবং পিয়েরে কুরী পিচব্লেন্ড তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করে রেডিয়াম এবং পলোনিয়াম এই দুইটি অতি তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ঐতিহাসিক সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে যে কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়েছিল তার তুলনা নেই। এক টন পিচ্‌ব্লেন্ড থেকে ওঁরা মাত্র কয়েক গ্রেন রেডিয়াম বের করে-ছিলেন। এই সব গবেষণার জন্য কুরী দম্পতি এবং বেকরেল নোবেল পুরস্কার পান।

ইউরেনিয়ামের পরমাণু থেকে তিনটি $\alpha$-কণা এবং দুইটি $\beta$-কণা বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে সেটি রেডিয়ামের পরমাণুতে পরিণত হয়। রেডিয়াম এবং তার থেকে যে রশ্মি বের হয়—সেগুলো ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়। এই জন্য রেডিয়ামের প্রধান চাহিদা। বস্তুতঃ ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই রেডিয়ামের জন্যই প্রধানতঃ ইউরেনিয়াম তথা ইউরেনিয়াম-আকরিকের প্রয়োজন ছিল। ইউরেনিয়ামের অন্যান্য ব্যবহার তখন গৌণ ছিল।

ইউরেনিয়ামে সর্বদা তিনটি আইসোটোপ একত্র থাকে। এদের পরিমাণ অবশ্য বিভিন্ন ; $^{238}\text{U}$ = ৯৯·২৭৪% ; $^{235}\text{U}$ = ০·৭২% এবং $^{234}\text{U}$ = ০·০০৬%। শেষেরটি নগণ্য, আর $^{235}\text{U}$ সামান্য পরিমাণে আছে বটে তবে তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম স্বাভাবিকভাবে যখন ভাঙ্গে তখন তার ওজন সামান্য হ্রাস পায়। একটি $\alpha$-কণা বেরিয়ে যায় তাই চার একক ভর কমে যায়। পক্ষান্তরে যদি একটি নিউট্রন কণা দিয়ে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে জোরে আঘাত করা যায় তবে সেটা প্রায় মাঝামাঝি ভেঙে গিয়ে দুইটি বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর পরমাণুতে পরিণত হয়। ১৯৩৮ সালে অটো হ্যান এবং ফ্রিজ স্ট্রাসম্যান এটি প্রথম করতে পেরেছিলেন। একে বলা হয় atomic fission বা পারমাণবিক বিখণ্ডন। উৎপন্ন পরমাণু দুইটির সঙ্গে দুই-তিনটি নিউট্রন কণাও তৈরী হয় এবং প্রচুর

তাপশক্তির সৃষ্টি হয়। বিখণ্ডনের সময় অতি সামান্য একটু পদার্থ লোপ পায়। যে পদার্থটুকু লোপ পায় তার বিনিময়েই আইনস্টাইন সূত্র অনুসারে ($\epsilon=mc^2$) বিপুল তাপশক্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, U-238 এরকম নিউট্রনের আঘাতে ভেঙে দু'টুকরো হয় না। একে ভাঙতে হলে অনেক বেশী শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন প্রয়োজন। ইউরেনিয়ামে যে U-235 স্বল্প পরিমাণে রয়েছে, সেইটেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। বিখণ্ডনের ফলে নানা রকমের পরমাণুর সৃষ্টি হতে পারে, একটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{92}_{36}Kr + ^{1}_{0}n + ^{1}_{0}n + Q \text{ (তাপশক্তি)}$$

নিউট্রন বেরিয়াম ক্রিপ্টন

বিখণ্ডনে যে দুইটি নিউট্রন-কণা তৈরী হল সেগুলো আবার প্রতিবেশী দুইটি U-235কে আক্রমণে করে ভেঙে দেয় এবং সেখান থেকে চারটি নিউট্রন কণা তৈরী হবে। সেগুলো আবার আরও চারগুণ U-235কে ভাঙবে। এরকম উত্তরোত্তর বেশী বেশী ভাঙন ও নিউট্রন-উৎক্ষেপ চলতে থাকবে। অর্থাৎ এক দ্রুত শৃংখল-বিক্রিয়ার (chain reaction) ফলে মুহূর্তে কোটি কোটি পরমাণু ভেঙে এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ তাপের উদ্ভব হয়। এরকম পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য কিন্তু যথাসম্ভব বিশুদ্ধ U-235 চাই। অ্যাটম-বোমাতে তাই ব্যবহৃত হয়। ইউরেনিয়াম থেকে সেইজন্য বিশুদ্ধ U-235-কে পৃথক করে নিতে হয়। এক কিলোগ্রাম U-235-এর বিস্ফোরণ ০'০০০০০১ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে।

উৎপন্ন নিউট্রন-কণা যদি U-238-কে আঘাত করে তাহলে সেটা ভাঙে না ; শৃংখল-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। U-238 নিউট্রনকে শুষে নিয়ে প্রথমে নেপচুনিয়াম এবং তা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়ামে পরিণত হয়।

$$^{238}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{239}_{93}Np + \beta; \quad ^{239}_{93}Np \rightarrow ^{239}_{94}Pu + \beta$$

নেপচুনিয়াম প্লুটোনিয়াম

TNT এক অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক। ২০০০০ টন TNT এর সমতুল্য বিস্ফোরণ হয় এক কিলোগ্রাম $^{235}U$-এর পারমাণবিক বিস্ফোরণে।

$^{238}U$ থেকে যে প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয় সেটাও $^{235}U$-এর মতই অনুরূপ শৃঙখল-ক্রিয়ায় বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। প্রথম যে অ্যাটম-বোমা হিরোসিমাতে ফেলা হয়েছিল (little boy, 6.8.45) সেটা ছিল $^{235}U$ দিয়ে তৈরী। আর নাগাসাকিকে ধ্বংস করা হয়েছে প্লুটোনিয়াম বোমা দিয়ে (Fat man, 9.8.45)।

আর একটা দিকও আছে। বিজ্ঞানীরা শৃঙ্খল-বিক্রিয়াটিকে সংযত করে বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে তার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। বিখন্ডনের প্রতিস্তরেই প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে (atomic reactor) বিখন্ডনকে ইচ্ছামত সংযত ও সীমিত করে উৎপন্ন শক্তিকে আজকাল অনেক দেশেই সংগ্রহ করা হচ্ছে। সেই শক্তি দিয়ে জাহাজ, সাবমেরিন, টারবাইন, কলকারখানা চালানো হচ্ছে। যখন সাধারণ জ্বালানি কয়লা, পেট্রোলিয়াম শেষ হয়ে যাবে, তখন এইটিই হবে শক্তির প্রধান উৎস।

ইউরেনিয়াম আজ মানব সমাজের ভাগ্য-নিয়ন্তা। বিভিন্ন দেশে বর্তমানে (১৯৮৩) ৫০০০০ হাজারেরও বেশী অ্যাটম বোমা মজুদ হয়েছে। ভবিষ্যতের কোন মহাযুদ্ধে এই চরম সমরোপকরণটি প্রয়োগ করলে সমস্ত জীবজগতের ধ্বংস অনিবার্য। অন্যদিকে যদি পারমাণবিক শক্তিকে কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাহলে সভ্যতার অগ্রগতি হবে। ইউরেনিয়াম কিভাবে ব্যবহৃত হবে—পৃথিবীর কল্যাণে না ধ্বংসে—সেটা মানুষের বিবেচনা আর বুদ্ধির উপর নির্ভর করছে।

একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, আজকের জগতের যত অনর্থের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। তখন অবশ্য এই লেখার কালিকলম, কাগজ, ছাপাখানা থেকে উড়োজাহাজ পর্যন্ত যা কিছু বিজ্ঞানের কাছ থেকে পাওয়া গেছে সেটা বেমালুম ভুলে যাওয়া হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অবদান ত আমাদের ভাল-মন্দের বিচার করে নয়। প্রকৃতির শক্তি ও সম্পদের সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাকে অধিগত করাই বিজ্ঞানের ধর্ম। বিজ্ঞানদেবীর এক হাতে রয়েছে অ্যাটম-বোমা আর মেসিন-গান আর অপর হাতে আছে পেনিসিলিন আর নাইলন। মানুষ এর কোনটি গ্রহণ করবে, কল্যাণ কি অকল্যাণ, সেটা তার বিবেচনাসাপেক্ষ। তার বুদ্ধির উপরেই মানবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

## থোরিয়াম (Th)

ইউরেনিয়ামের মত থোরিয়াম ধাতুটিও তেজস্ক্রিয় এবং পারমাণবিক শক্তির উৎপাদনে প্রয়োজন। নরওয়েতে পাওয়া একটি কালো খনিজ থেকে থোরিয়ামকে আবিষ্কার করেন সুইডেনের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস (১৮২৯), যার আরও চারটি মৌল আবিষ্কারের কৃতিত্ব রয়েছে; সেলেনিয়াম, জারকোনিয়াম, সিলিকন আর সিরিয়াম। সুইডেনের পৌরাণিক দেবতা ওডিনের পুত্র থর ছিল প্রচন্ড শক্তিধর। সেই থরের নামানুসারে বার্জেলিয়াস এই নব আবিষ্কৃত ধাতুর নাম দেন থোরিয়াম এবং ঐ খনিজের নাম হয় থোরাইট।

ইউরেনিয়ামের তুলনায় থোরিয়াম পৃথিবীতে অনেক বেশী আছে। কিন্তু সেটা প্রাচীন শিলার মধ্যে আকীর্ণ। লক্ষ লক্ষ বছরের জল বায়ুতে প্রাকৃতিক শিলাক্ষয়ে সেই সব খনিজ বিচূর্ণ হয়ে এসে সমুদ্র-সৈকতে স্থান পেয়েছে। এর প্রধান আকরিক মোনাজাইট—থোরিয়াম ফসফেট। আর একটি অপেক্ষাকৃত বিরল আকরিক থোরাইট। মোনাজাইটের সব চেয়ে বড় এবং প্রধান ও বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে আমাদের কেরালার সাগর উপকূলের কালো বালিতে। এই বালুতে ইলমেনাইট ও জারকন ছাড়াও অন্ততঃ শতকরা ১ ভাগ মোনাজাইট রয়েছে। এ ছাড়া ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও মোনাজাইট পাওয়া যায়। আগে আমাদের মনাজাইটকে বালু থেকে পৃথক করে নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হত। ১৯৫১ সাল থেকে সরকারী নির্দেশে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে মোনাজাইট থেকে থোরিয়া ( থোরিয়াম অক্সাইড ) উৎপাদন শুরু হয়েছে। এই উৎস থেকে বিরল-মৃত্তিক ধাতু সিরিয়াম, ল্যান্থানাম প্রভৃতিও কিছু সংগ্রহ করা হচ্ছে।

গ্যাসবাতির ম্যান্টেলে থোরিয়ার ব্যবহারের জন্য প্রধানতঃ মোনাজাইটের কদর ছিল। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদনের কাজে থোরিয়ামের চাহিদা বেশী।

সীমিত শক্তির নিউট্রন তেজষ্ক্রিয় স্বাভাবিক থোরিয়ামকে ($^{232}Th$) আঘাত করলে, থোরিয়াম সেটি গ্রাস করে ($^{233}Th$) আইসোটোপে পরিণত হয়। সেটিও তেজষ্ক্রিয় এবং ধীরে ধীরে পর পর দুই ক্ষেপে দুইটি $\beta$-কণা উৎসারিত করে $^{233}U$-এর আইসোটোপ সৃষ্টি করে।

$$^{232}_{90}Th + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{233}_{90}Th \xrightarrow{\beta} {}^{233}_{91}Pa \xrightarrow{\beta} {}^{233}_{92}U$$

$^{235}U$ কিংবা $^{239}Pu$ প্লুটোনিয়ামের মত নিউট্রনের আঘাতে $^{233}_{92}U$ পরমাণুর বিখণ্ডন হয় এবং যথারীতি শৃঙ্খল বিক্রিয়াও হয়। সুতরাং পারমাণবিক চুল্লীতে $^{233}U$ ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যায়। এই কারণেই থোরিয়াম বিশেষ মূল্যবান।

ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি থেকে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে $\alpha$ অথবা $\beta$-কণা উৎসারিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অ-তেজস্ক্রিয় মৌল সীসা বা বিসমাথ পাওয়া যায়। এর ফলে মৌলদের ক্রমাঙ্ক অবশ্যই হ্রাস পায়।

পৃথিবীতে পাওয়া মৌলদের মধ্যে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রই সর্বাধিক গুরুভার। এর ক্রমাঙ্ক, ৯২। এই কেন্দ্রকে নিউট্রন দিয়ে আক্রমণ করিয়ে উচ্চতর ক্রমাঙ্কের মৌল নেপচুনিয়াম ধাতু ( ক্রমাঙ্ক ৯৩ ) পাওয়া গেছে। আবার নেপচুনিয়াম

$\beta$-কণা উৎসারিত করে আরও উচ্চতর ক্রমাঙ্কের (৯৪) প্লুটোনিয়াম দেয়। অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে আরও অধিকতর গুরুভার উচ্চতর ক্রমাঙ্কের মৌল প্রস্তুত সম্ভব হয়েছে। এভাবে ৯৩ থেকে শুরু করে অন্ততঃ ১০৩ ক্রমাঙ্কের কৃত্রিম মৌল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিই তেজস্ক্রিয় ধাতু। এদের প্রস্তুতিতে অবশ্য নিউট্রন-কণা, $\alpha$-কণা, ডয়টেরিয়াম-কণা, কার্বন-কেন্দ্রক প্রভৃতি নানা শক্তিশালী ক্ষেপনক দিয়ে সুকৌশলে ভারী পরমাণুকে আঘাত করা প্রয়োজন হয়। ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলদের ক্রমাঙ্কসহ একটি সারণী দেওয়া হল। এদের বলা হয় অ্যাকিটনাইড মৌল শ্রেণী।

ইউরেনিয়ামত্তোর মৌল শ্রেণী

| | |
|---|---|
| ৯৩ নেপচুনিয়াম (Np) | ৯৯ আইনস্টেনিয়াম (En) |
| ৯৪ প্লুটোনিয়াম (Pu) | ১০০ ফের্মিয়াম (Fm) |
| ৯৫ আমেরিকিয়াম (Am) | ১০১ মেণ্ডেলিভিয়াম (Md) |
| ৯৬ কুরিয়াম (Cm) | ১০২ নোবেলিয়াম (No) |
| ৯৭ বার্কেলিয়াম (Bk) | ১০৩ লরেন্সিয়াম (Lw) |
| ৯৮ কালিফোর্নিয়াম (Cf) | |

* * *

আজকের দিনের ধাতুর এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অতি প্রাচীনকালে ধাতুর সন্ধান পেয়েছিল বলেই মানুষ তখন তার আত্মরক্ষার উপায়ের উন্নতি করতে পেরেছিল, জীবনযাত্রার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পেরেছিল, ছোট ছোট হাতিয়ার দা, কুড়াল পেয়ে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব করতে পেরেছিল, সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতিও সম্ভব হয়েছিল। আজ আরও ব্যাপকরূপে সেই ধাতুই সভ্যতার অগ্রগতিকে সাহায্য করছে। আজকের দিনে যানবাহনে, শিল্প-কারখানায়, প্রতিরক্ষায়, কৃষিতে, চিকিৎসায়, ছাপাখানায়, দৈনন্দিন প্রয়োজনের নানা জিনিসে, মুদ্রাতে, সর্বত্র শুধু ধাতুর প্রাধান্য নয়, ধাতু অপরিহার্য। ধাতু আছে রক্ত কণিকার হেমোগ্লোবিনে, গাছের পাতার সবুজ ক্লোরোফিলে। তারপর মানুষ যখন ১৯৩৮ সালে পরমাণুকে ভেঙে বিজ্ঞানের নবতর যুগে প্রবেশ করল, তখন ধাতু এগিয়ে এল শক্তি-উৎপাদনে, যার উপর এখন ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা নির্ভর করছে। ধাতুকে বাদ দিয়ে এখন আর দৈনন্দিন জীবনের কথা কল্পনা করা যায় না।

## গ্রন্থপঞ্জী

(১) বিজ্ঞানের ইতিহাস—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন
(২) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
(৩) রসায়ন ও সভ্যতা—প্রিয়দারঞ্জন রায়
(৪) প্রাগ্ ইতিহাসের কথা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু
(৫) সভ্যতার আগে—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু
(৬) ভারতের খনিজ সম্পদ—শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(৭) নবযুগের ধাতু চতুষ্টয়—ডঃ জগন্নাথ গুপ্ত
(৮) ভারতের খনিজ—রাজশেখর বসু

1. History of Chemistry in Ancient and Medieval India —P. Rây
2. Story of Civilisation. Vol I—Will Durrant
3. History of Chemistry—J. R. Partington
4. Discovery of the elements—Mary Elvira Weekes
5. Text Book of Inorganic Chemistry (6th Edn.) —J. R. Partington
6. Reader's digest, March. 1961